ইউনিট ১০
প্রবন্ধ রচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থী–

- কথাসাহিত্যের বিশেষ শাখা হিসেবে প্রবন্ধের স্বরূপ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবন্ধের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য কীভাবে সুশৃঙ্খলভাবে লিখতে হয় তা শিখতে পারবেন।
- বক্তব্য কীভাবে বিস্তৃত অথচ নির্মেদ করতে হয় তা শিখতে পারবেন।

প্রবন্ধ কী?

প্রবন্ধ হচ্ছে কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রবন্ধ শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'প্র+বন্ধ'। 'প্র' অর্থ এখানে প্রকৃষ্ট। 'বন্ধ' অর্থ বন্ধন। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন বা বাঁধা। কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যকে যুক্তি, তর্ক, তত্ত্ব, তথ্য, দৃষ্টান্ত, প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সহযোগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে উপস্থাপনের নামই প্রবন্ধ। প্রবন্ধে সাধারণত কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখক তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটান। প্রবন্ধকে সাধারণভাবে রচনাও বলা হয়ে থাকে।

প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ

প্রবন্ধ সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে–

১. বস্তুনিষ্ঠ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ বা তন্ময় প্রবন্ধ এবং

২. ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘু চালের প্রবন্ধ বা মন্ময় প্রবন্ধ

বস্তুনিষ্ঠ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ অত্যন্ত গোছানো, পরিকল্পিত, যুক্তিনিষ্ঠ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

আর ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘুচালের প্রবন্ধে কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আবেগ-অনুভূতি বিচার-বিশ্লেষণ, সচেতন যুক্তিনিষ্ঠতা, তত্ত্ব, তথ্য, প্রামাণিক উদ্ধৃতি ছাড়াই উপস্থাপিত হয়। এই কারণে এ ধরনের প্রবন্ধের চলন হয় লঘু বা হালকা।

প্রবন্ধ রচনার কৌশল

১. যে বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখা হবে সে বিষয়-সংশিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণ আগেই ঠিক করতে হবে।

২. যে বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হবে সেই বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে আলো ফেলতে হবে। অর্থাৎ যতভাবে বিষয়টিকে দেখা যায় ততগুলো উপশিরোনাম বা অনুচ্ছেদ ঠিক করতে হবে।

৩. উপশিরোনামগুলো বা অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে একটি ঐক্য থাকতে হবে।

৪. একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫. অনাবশ্যক উদ্ধৃতি, তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. প্রবন্ধে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ ঘটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে সরল ও প্রাঞ্জল কিন্তু অব্যর্থ।

৭. প্রবন্ধ লেখার সময় এর মূল কাঠামোর দিকে নজর রাখা জরুরি। প্রবন্ধের মূল কাঠামোর তিনটি অংশ থাকা আবশ্যক– ভূমিকা, মূল অংশ এবং উপসংহার।

একটি ভালো প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. একটি ভালো প্রবন্ধের বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ।

২. প্রবন্ধের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সম্পর্ক হবে জৈবিক। গঠনগত ঐক্য প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
৩. প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিকের চিন্তার স্বচ্ছতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।
৪. প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যথাযথভাবে বিন্যাস করতে হয়।

বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগের বেশি মানুষ কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করেন। এজন্য বাংলাদেশকে কৃষি প্রধান দেশ বলা হয়ে থাকে। কৃষকরাই আমাদের দেশের প্রাণ। তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছেন। দেশের কল্যাণে, দেশ ও দশের সহযোগিতায় তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকেন। কৃষকের প্রতি আমাদের সম্মানের অন্ত নেই। কবি, দার্শনিক বা লেখকগণ তাঁদের অবদানকে স্বীকার করেছেন। কবি কৃষকদের সম্পর্কে বলেছেন–

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

কৃষকদের অতীত : পৃথিবীতে মানুষের সংস্কৃতি শুরু হয় কৃষিকাজের মাধ্যমে। আমাদের দেশেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নদী, নালা, খালবিলের সমারোহ আমাদের এই বাংলা ভূমি। এখানে এক সময় ছিল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর নালা ভরা মাছ। তখন কৃষকের মুখে হাসি ফুটে উঠত। প্রকৃতির অনুকূল হলেই কৃষক তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতেন। নিজেদের উৎপাদিত ফসল দিয়েই তাঁদের প্রয়োজন মিটে যেত। অভাব তাঁদেরকে তাড়া করে বেড়াত না। কাজেই তাঁদের জীবন ছিল সহজ, সরল, নিরাপদ ও সুখময়। কৃষকদের কণ্ঠে উচ্চারিত নিচের লোকগীতির চরণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

আমরা চাষী ফসল ফলাই
গোলা ভরা ধান
বাড়ির গাছে সবরী কলা
বাটা ভরা পান।

কৃষকদের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে প্রযুক্তি উন্নতির ফলে কৃষকদের কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তিগত অনেক জিনিসের ব্যবহার হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় তাঁদের কষ্ট অনেক লাঘব হয়েছে। তাঁরা আর অমানবিক পরিশ্রম করেন না। তারপরও আমাদের দেশের কৃষকদের সেই প্রাচুর্য নেই। অধিক জনসংখ্যার চাপে আবাদী জমি কমে যাওয়ার ফলে কৃষকদের এই অবস্থা। অন্যদিকে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কৃষকদেরকে দিনের পর দিন খারাপ অবস্থারে দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির কারণে কৃষকেরা কৃষিকাজে আশানুরূপ ফসল পাচ্ছে না। সারের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিকাজের উপকরণের দাম, কাজের লোকের সঙ্কট ও অধিক টাকা খরচের কারণে কৃষকেরা লাভবান হতে পারছেন না। তাই বাধ্য হয়ে অনেক কৃষক অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। নিরূপায় বাংলাদেশের কিছু কৃষক তাঁদের পূর্বের পেশা চালিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের উপায় : বাংলাদেশের কৃষিকাজকে বাঁচাতে হলে কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কৃষকদের উন্নতির সঙ্গে আমাদের দেশের উন্নয়নের প্রশ্নটিও জড়িত। কৃষকদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে তাঁদেরকে সরকারিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নতির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, স্বল্পমূল্যে সার বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু এসব কমকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না, ফলে প্রকৃত ও অভাবী কৃষকেরা এর সুফল পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকে আরও সজাগ থাকতে হবে। যত্রতত্র ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা স্থাপন করে যাতে কৃষকের আবাদী জমি নষ্ট না হয় সেদিকে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। কৃষকেরা যাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অধিক শস্য উৎপাদন করতে পারে, সেদিকটিও সরকারকে নজরে আনা উচিত। ফসল বিক্রি করে কৃষকেরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় তাও সরকারকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব বিষয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে কৃষকদের ভাগ্যের উন্নতি করা সম্ভব।

বাংলাদেশে কৃষকের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি পেশার সঙ্গে সংশিষ্ট। এদেশের কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে দেশের উন্নতিও জড়িত। আমাদের প্রধান খাবার এ দেশের কৃষকেরাই উৎপাদন করে থাকে। এসব পণ্য আমরা স্বল্প

মূল্যেই ক্রয় করতে পারি। কিন্তু দেশের কৃষির অবস্থা যদি ভালো না হয়, কৃষকেরা যদি তাঁদের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়, তবে আমাদের দেশের প্রধান শস্য অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হবে। এসব পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হবে যা আমাদের অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। দেশের যে অগ্রযাত্রা কৃষিবিপবের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে তা ধরে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমাদের দেশের কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কৃষিকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের কৃষকের গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার : আমাদের দেশের কৃষকের গৌরোবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। তাঁরা আমাদের দেশের খাদ্যের যোগানদাতা। কৃষকই আমাদের দেশের প্রাণ। তাঁদের উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা ঘোরানো সম্ভব নয়। তাই কৃষকের অতীত ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কৃষকেরা যাতে লাভবান হয় সেদিকে সরকারকে নজর দেয়া প্রয়োজন। কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে- এই শোগান সামনে রেখে তাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কবির কথায়– 'বাঁচতে হলে লাঙল ধররে আবার এসে গাঁয়'।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)

সূচনা : আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি মানব জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : আরব জাতি ও ইসলামের অন্ধকার যুগে তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ সাদিকের সময় মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুলাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের ছয়মাস পূর্বে পিতা এবং জন্মের ছয় বছর পর মাতা মারা যান। তারপর পিতামহ আবদুল মোতালেব তাঁকে লালন পালন করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও কৈশোর কাল : ছোটকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত ধার্মিক, পরিশ্রমী ও সত্যবাদী ছিলেন। শৈশবে তিনি চাচা আবু তালিবের মেষ চরাতেন। এ কাজে তিনি কখনও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেননি। বাল্যকাল হতেই তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় কাল থেকেই লোকে তাঁকে আল আমিন উপাধি দেয়।

যৌবন ও সাধনা : বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভাবতে থাকেন। তিনি সব সময় স্রষ্টার আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। কীভাবে আরব জাতি তথা মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে ভাবতে থাকেন। ২৫ বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে আরবের অন্যতম এক ধনি মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশে গমন করেন। হযরতের গুণে এবং রূপে মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছরের খাদিজা তাঁকে বিয়ে করেন।

ধর্ম প্রচার : বিবি খাদিজাকে বিয়ে করার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও দীনের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা ধ্যানে মগ্ন থাকতে লাগলেন। ৪০ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহি নাযিল হলে তিনি নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। জিব্রাইল (আ.) ওহি তথা কোরআন শরিফের আয়াতগুলো আল্লাহর হুকুমে হযরত মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসতেন। তারপর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এর মূল কথা হলো আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। ধর্ম প্রচার কালে তাঁর হাতে মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজা (রা.) এবং পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন। দিনের পর দিন ইসলামের পতাকাতলে অনেকেই শরিক হতে লাগলেন। এভাবে ইসলামের আলোয় আলোকিত হয় পুরো বিশ্ব। সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার দূর হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম প্রচারে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম চারিদিকে প্রচার হতে লাগল।

হযরত মুহাম্মদের বিপদকাল : হযরত মুহাম্মদের প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার দূর হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম প্রচারে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম চারিদিকে প্রচার হতে লাগল।

হযরত মুহম্মদের বিপদকাল : হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত ইসলাম যখন আরববিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন ইসলামের বিপথগামী ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীরা হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা ও তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য

কতিপয় লোক মরিয়া হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত আবুবকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিযরত করলেন। ধর্মের জন্য তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধ ব্যতীত তিনি প্রায় সব যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

চরিত্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আদর্শ মানব। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রচারকৃত ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম। তিনি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, ন্যায়পরায়ণ শাসক, ধৈর্যশীল এবং সমভাবে করুণাশীল। এমন কোনো মহৎ গুণাবলি নেই যা হযরত মুহাম্মদের ছিল না। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়, সচ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন আল আমিন বা বিশ্বাসী– মানব জাতির অন্যতম পথ প্রদর্শক।

মৃত্যু : হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার : হযরত মুহাম্মদ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও ইসলামের শেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি বা রাসূল পৃথিবীতে আগমন করবেন না। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় মানুষ। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

চরিত্র

সূচনা : চরিত্র মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চরিত্রবান লোককে সবাই বিশ্বাস ও পছন্দ করে। মনে রাখতে হবে ধন দৌলত, রূপ-মাধুর্য, আভিজাত্য মানুষের আসল পরিচয় নয়, তার আসল পরিচয় হলো চরিত্র-গুণে। চরিত্রবান লোক দেশ ও দশের সম্পদ এবং গৌরব।

চরিত্রের সংজ্ঞা : চরিত্র বলতে একজন মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ ও আদর্শের সমন্বিত প্রকাশ বুঝায়। চরিত্র মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রগামী করে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যানুরাগ ইত্যাদি চরিত্রবান লোকের লক্ষণ।

সচ্চরিত্রের লক্ষণ: চরিত্রবান লোক সবার প্রিয়। এরূপ লোককে সবাই ভালোবাসে ও পছন্দ করে। কারণ চরিত্রবান লোক অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না, কাউকে ক্ষতি করে না। সর্বদা দেশ ও জনগণের কল্যাণে সে আত্মনিয়োগ করে। তিনি সদালাপী, বিনয়ী, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি মাথানত করেন। সর্বদা সত্যকে ধারণ করেন, কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ তিনি রক্ষা করে চলেন। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যকে গ্রহণ করেন, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি মাথানত করেন। সর্বদা সত্যকে ধারণ করেন, কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ তিনি রক্ষা করে চলেন। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যকে গ্রহণ করেন, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে চলেন। তাঁর দ্বারা মানবের অপকার হয় না, সর্বদা কল্যাণ সাধিত হয়। শত্রুরাও তাঁকে বিশ্বাস করে।

চরিত্রবান ব্যক্তি আত্মত্যাগী : চরিত্রবান লোক কেবল নিজের কথা ভাবেন না তিনি দেশের, সমাজের তথা পরিবারের সবার কথাই ভাবেন। ভয়, অন্যায়, জুলুম কিছুতেই তিনি সত্যত্যাগ করেন না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন সচ্চরিত্রের প্রকৃত উদাহরণ। তিনি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন। তিনি নিজের জন্য কমই ভেবেছেন। মানব জাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে মানবের জীবনকে তিনি আলোকিত করে গেছেন।

চরিত্রহীনতার কুফল : চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। চরিত্রবান ব্যক্তির ধন, শিক্ষা, আভিজাত্য যা-ই থাকুক না কেন, কেই তাকে বিশ্বাস করে না, কেউ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। চরিত্রহীন লোক ইহজগতে কেবল ঘৃণিত নয়, পরজনমেও সে আলাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই চরিত্রহীনতার পরিণাম ভয়াবহ। ইংরেজিতে বলা হয়–

When money is lost, nothing is lost,
When health is lost, something is lost,
But when charachter is lost, everything is lost.

মহামানবের আদর্শ : পৃথিবীতে অনেক মনীষী বা সাধারণ মানুষ চরিত্রের গুণে মহামানব হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত ঈসা (আ.), হাজী মুহম্মদ মহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রা.) প্রমুখ চরিত্রের গুণে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। আবার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকের কথাই শোনা যায়, যারা কুচরিত্রের কারণে পৃথিবীতে ধ্বংস হয়েছেন।

উপসংহার : চরিত্রই হচ্ছে মানব জীবনের মুকুট। চরিত্রবান লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি পরিবার, সমাজ ও দেশের আলোকবর্তিকা; তাঁর আলোয় আলোকিত হয় বিশ্ব। সুতরাং প্রত্যেকেই চরিত্রবান হওয়া উচিত।

অধ্যবসায়

ভূমিকা : অধ্যবসায় মানুষের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। পৃথিবীতে যাঁরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, তার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়। পৃথিবীতে যা কিছু মহান, সুন্দর ও কল্যাণকর– তার সবই অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : জীবনের সব ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভালো কাজ সম্পাদানের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও সহনশীলতা, কারণ প্রতিটি মহৎ কাজের সামনে থাকে বড় রকমের বাধা। সেই বাধাকে অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করতে হয়। কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি কারো ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তবে সেকাজে সাফল্য অর্জন করা যায় না। এসব বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সামনে চলার নাম জীবন। আর এ ধরনের কাজ বাস্তবায়ন করা যায় অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের পরে সুখ আসে, অন্ধকারের পরে আসে আলোর দ্যুতি। ঠিক তেমনি ব্যর্থতার পরে আসে সফলতা। ব্যর্থতা জীবনে আসবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তার ভয়ে কাজ থেকে দূরে থাকলে উন্নতির সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি লিখেছেন–'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। সত্যিই বার বার পরিশ্রম করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত : পৃথিবীতে অনেক মানুষ অধ্যবসায়ের গুণে অমর হয়ে আছেন। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুশ ইংরেজদের সঙ্গে পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হন। পলায়নরত অবস্থায় তিনি এক গুহায় শুয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, একটা মাকড়সা বার বার একটি স্তম্ভের গায়ে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু খানিকটা উঠেই পড়ে যাচ্ছে। এভাবে মাকড়সাটি ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারের চেষ্টায় দেয়ালের গায়ে উঠতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পেলেন। তিনি আবার তাঁর সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। সপ্তমবারে রাজা রবার্ট ব্রুশ তাঁর দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন। ফরাসি দেশের বিখ্যাত রাজা নেপোলিয়ান একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অধ্যবসায়ের গুণে তিনি সে দেশের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যবসায়ের দ্বারা কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা। বিজ্ঞানী নিউটন বলতেন, 'আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফল।'

উপসংহার : অধ্যবসায় জীবনে সাফল্য অর্জনের চালিকাশক্তি। পৃথিবীতে যাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন অধ্যবসায়ী। কাজেই অধ্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের উচিত জীবনকে সুন্দর করে তোলা। ছাত্রজীবন থেকেই অধ্যবসায়ী হলে সারাজীবন এ ধারা বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখতে হবে, জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই।

মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া আমাদের জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস সহজ হয়েছে। আদিম জাতি থেকে মানুষ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। এভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের অবদান : আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানব সভ্যতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে বিজ্ঞানের হাত নেই। বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে জলে-স্থলে-আকাশে মানুষের ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব আজ মানুষ হাতের মুঠোয়

নিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ। এ আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা দ্রচতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যোগাযোগ সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান : বিজ্ঞানের অবদানের ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের অবদানে ঔষধ আবিস্কার করে মানুষ মরণব্যাধি অসুখ জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া নানারকম চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণে উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে মানুষ অধিক ফসল উৎপাদন করছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষকেরা পূর্বের তুলনায় অধিক ফসল উৎপাদন করছেন।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : বর্তমান আধুনিক কালের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান কল্যাণ অনস্বীকার্য। কম্পিউপার, মোবাইল, জাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মানুষের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ ঘরে বসেই তথ্য আদান প্রদান ও দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতে পারছে বিজ্ঞানের কল্যাণে।

বিজ্ঞানের অপকারিতা : বিজ্ঞান কেবল মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে তা নয়, বিজ্ঞান মানুষের অনেক ক্ষতিও করেছে। এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা আজ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ, মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে হাজার হাজার ঘরবাড়ি, ফসল ও মানুষের প্রাণনাশ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার বোমাবর্ষণের ফলে ধবংসযজ্ঞ তারই বাস্তব প্রমাণ। বর্তমানে খুন, রাহাজানি, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে চলেছে বিজ্ঞানের অপব্যবহারে মাধ্যমে।

উপসংহার : বর্তমান মানুষের এই সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিজ্ঞান গতিময় করে তুলেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে মানবের কল্যাণে ব্যবহার করলে মানুষের জীবন আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আরও সাবলীল হবে এবং সুন্দর হবে– এই প্রত্যাশা সবার।

কম্পিউটার

সূচনা : বর্তমান যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। কম্পিটার আবিষ্কারের ফলে মানুষ পৃথিবীকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখা প্রভৃতি মানুষ সহজ করেছে কম্পিউটার আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কারের পেছনে এই কম্পিউটারের রয়েছে অসাধরণ ভূমিকা। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করতে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে কম্পিউটারের গুরুত্ব অধিক। মোট কথা, কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবন পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ সমৃদ্ধ হয়েছে।

কম্পিউটার কী : কম্পিউটার ইংরেজি শব্দ। কম্পিউটার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। এর অর্থ গণনাকারী বা হিসাব গণনাকারী যন্ত্র। যে যন্ত্রের সাহায্যে গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ নির্ভুল করা যায়, তাকে বলা হয় কম্পিউটার। এ যন্ত্রের জনক হলেন চার্লজ ব্যাবেজ। ইলেকট্রনিক এ যন্ত্রটি যোগ, বিয়োগ, গুণভাগের হিসাব ছাড়াও দ্রত গতিতে অসংখ্য ড্যাটা গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতি দ্রুত বিশেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। মানুষের যে হিসাব করতে সময় লাগতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কম্পিউটার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে পারে।

উদ্ভবকাল : কম্পিউটার এক অত্যাধুনিক যন্ত্র যার উদ্ভাবন ও বিকাশ চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ফরাসি গণিতবিদ বেইজি প্যাসকেল ১৬৪২ সালে যোগ বিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম গণনাযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৬৭১ সালে লেবনিজ উদ্ভাবন করেন ক্যালকুলেটর এবং চার্লস ব্যারেজ আধুনিক ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন করেন ১৮১২ সালে। ১৯৪৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই ভি এম কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার। ১৯৪৬ সালে প্রথম

উদ্ভাবন হয় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। ১৯৭১ সালের পর থেকে কম্পিউটারের জগতে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং দীর্ঘ পরিক্রমায় কম্পিউটার আজ এই রূপ ও আকার ধারণ করেছে।

কাঠামো : কম্পিউটারের দুটি দিক রয়েছে– কম্পিউটারের যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়ার এবং প্রোগ্রাম সরঞ্জাম বা সফ্টওয়ার। তথ্য গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয় প্রবেশমুখ অংশ, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয় গাণিতিক অংশ, তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্মৃতি এবং নিয়ন্ত্রণবর্তনী হলো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়ারের অন্তর্গত। যান্ত্রিক এই অংশ কর্মক্ষম ও কার্যকর হয়ে উঠতে সাহায্য নেয় প্রোগ্রাম অংশের। প্রোগ্রাম আবার দুই ধরনের। ব্যবহারিক পোগ্রাম ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম। ব্যবহারিক প্রোগ্রাম গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে এবং পদ্ধতি প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

কম্পিউটারের প্রোগ্রাম : বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারে যে মেমোরি থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম। কম্পিউটারের কাজ বা প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য যে ভাষার প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় কম্পিউটারের ভাষা। এ ভাষা ব্যবহার করা হয় বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে।

প্রকারভেদ : কম্পিউটারকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। কম্পিউটারের ব্যবহার ও প্রকৃতি অনুযায়ী সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি এবং মাইক্রো কম্পিউটার প্রভৃতি ভাগে কম্পিউটারকে ভাগ করা হয়েছে।

কম্পিউটারের গুরুত্ব : চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, গবেষণা, পুস্তক-প্রকাশনা, যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ, সংবাদ প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান অনস্বীকার্য। কোনো দেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে দরকার সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার উন্নয়নে মানুষ সাফল্য অর্জন করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় কম্পিউটার সাফল্য এনেছে। অতি সহজেই এই যন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ করা যায়। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটার ব্যবহার করে মানুষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সুখময় করে তুলেছে।

অপকারিতা : কম্পিউটার অপব্যবহার করে একদল বিভ্রান্ত লোক দেশ ও জনগণের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। অর্থ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানুষ এসব অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। কাজেই তারা মানুষের কল্যাণ না করে মানুষের অকল্যাণ করে চলেছে। এটি কম্পিউটারের দোষ নয়। যে কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করছে, তার মনের সমস্যা ও চিন্তা চেতনার সমস্যা।

উপসংহার : কম্পিউটার এক সম্ভাবনাময় যন্ত্র। এ যন্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে মানবকল্যাণের দিক আরো উন্মোচিত হবে। মানুষের জীবনকে কম্পিউটার যেভাবে বদলে দিয়েছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে এ যন্ত্রকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারলেই এ থেকে প্রকৃত সুযোগ ভোগ করা যাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সূচনা : মানুষ জন্মের পরে যে-ভাষা আয়ত্ত করে তাকে বলা হয় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বলতে বোঝায় যে-মাতৃভাষাটি আন্তর্জাতিকভাবে বছরের কোনো একটি দিনে পালন করা হয়। ভাষা একটি জাতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হলো বাংলা। এ ভাষায়ই এদেশের মানুষ কথা বলে, লেখন লেখে। তাই মাতৃভাষার প্রতি এদেশের মানুষের রয়েছে অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এদেশের মানুষ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করেছে। সেই থেকে বাঙালি পরম শ্রদ্ধার সাথে তাদের আত্মত্যাগের মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে আসছে। গত ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলা ভাষার অতীত : বাংলা ভাষার জন্ম আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর পূর্বে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ– এ বৌদ্ধ সাধকদের ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব বর্ণনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে তৎকালীন মানুষের নানা সুখ-দুঃখের বাস্তব ছবি। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান শাসনামলে রাজভাষা সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা থাকায় বাংলা ভাষা তেমন মর্যাদা পায়নি। কিন্তু সময়ের আবর্তে এক সময় মুসলমান শাসকেরা রাজভাষা চর্চা শুরু করেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা

ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলি* নোবেল পুরস্কার পেলে বাংলা ভাষা বিশ্বে সাদরে আসীন হয়। এভাবে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের অবস্থানে আসীন হয়েছে। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ আমাদের বাংলা ভাষার মর্যাদাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে।

বাংলা ভাষার জয়যাত্রা : ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্টভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তখন থেকে বাংলা ভাষা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলা ভাষা চর্চার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার : বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কথা বলা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন– শিক্ষা, অফিস-আদালত, ও চর্চার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা কতটা গ্রহণীয় হচ্ছে তা দেখা দরকার। আমাদের দেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে বাংলা প্রধান বাহন। বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং আরবি ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া অন্য একটি ধারা যেখানে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়, সেখানে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা শেখানো হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে বই, জার্নাল, গবেষণাকর্ম ইত্যাদি বাংলা ভাষায় সমাপণ জরুরি হলেও সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের বাংলায় যথাযথ গ্রন্থ রচনা করতে হবে। এতে করে ইংরেজির প্রতি শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলতা কমবে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি : একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল আমাদের দেশের মাতৃভাষা দিবস নয়, এ দিবসটি এখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের অনন্য ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং শহিদের প্রতি সারা বিশ্বে স্মরণীয় রাখতে এ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ছাড়াও প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কোর ১৮৮ দেশ এবং ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তে বিশ্বের সব ভাষা সম্মানিত হল। ১৯৯৭ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

উপসংহার : বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাংলা আমাদের মমতার ভাষা। এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি অনেক তাজা প্রাণ বাংলাদেশের রাজপথকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার চর্চা ধারণ করতে হবে আমাদের মননে ও প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও মাতা এই পরম বস্তুটিকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তবেই আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে চর্চা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

সংবাদপত্র

সূচনা : বর্তমান সভ্যতার বাহন হলো সংবাদপত্র। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্র না হলে চলে না। আদিম কালে মানুষ কেবল খাদ্য সংগ্রহ ও ক্ষুধা নিবারণের কাজেই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে মানুষ কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, তারা আরও অনেক কিছু , অনেক দেশের কথাও জানতে চায়। মুহূর্তের মধ্যেই মানুষ এক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবর জানতে পারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। বিভিন্ন দেশের নানা ঘটনার সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষিত মানুষের কাছে সংবাদপত্র হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার।

সংবাদপত্রের ইতিহাস : সর্বপ্রথম কখন, কোথায় সংবাদপত্রের প্রচলন হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, ইতালির ভেনিস শহরে প্রথম সংবাদপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, চীন দেশের অভিজাত বংশীয়দের জন্য সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এক ধরনের হাতে লেখা সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা সাময়িক পত্র দিগদর্শন প্রকাশিত হয়। একই বৎসর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* প্রথমে সাপ্তাহিক ও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেই থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর দেশে বিভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সংবাদপত্র *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়।

সংবাপত্রের প্রকারভেদ : সংবাদপত্র নানা প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক প্রভৃতি বেশি প্রচারিত হয়। এ সংবাদপত্রগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে। তবে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক প্রভৃতি পত্রিকাগুলো সাধারণত শিল্পসাহিত্য বা বিজ্ঞান গবেষণামূলক হয়ে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা : সংবাদপত্র মানুষের বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে। সংবাদপত্রকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। কারণ সব ধরনের জ্ঞান এই সংবাদপত্র থেকে আহরণ করা যায়। বর্তমান আধুনিক যুগে সংবাদপত্র ছাড়া যেন আমাদের চলে না। এর মাধ্যমেই আমরা বর্তমান শিক্ষা, প্রশাসন, বাণিজ্য, খেলাধুলা, বৈদেশিক রাজনীতি, বাজার দর, বৈদেশিক সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হই। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নতুন ক্রিয়াকর্ম, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সংবাদপত্র আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও প্রসারিত করে দিয়েছে। সংবাদপত্রে জনসাধারণের মতামত, দাবি-দাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, সরকারি কর্মচারীদের দোষ ত্রুটি, দুর্নীতির সমালোচনা করে। ফলে জনগণের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি হয়। সংবাদপত্রে বিভিন্ন গঠনমূলক সমালোচনা হয় বলে সাধারণ মানুষ ও সরকার উভয়পক্ষই উপকৃত হয়। এছাড়া সমাজ সেবামূলক প্রচারে, দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করতে জনগণ দেশের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে, জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব শ্রেণির মানুষ নানাভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

অপকারিতা : সংবাদপত্র অনেক সময় জনগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিস্বার্থ বা কোনো গোষ্ঠীকে প্রাধ্যান্য দিয়ে সংবাদ প্রচারিত হলে তা দেশের অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই সংবাদপত্রকে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও মানবকল্যাণী হতে হবে।

উপসংহার : সংবাদপত্র মানুষের নিত্যদিনের বন্ধু। সংবাদপত্র মানুষের জ্ঞানকে আরও বিকশিত করেছে। জীবন ও জগতকে জানার এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে চলেছে সংবাদপত্র। কাজেই দলীয় সিদ্ধির জন্য সংবাদপত্রে গুজব, উস্কানিমূলক তথ্য, মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচার না করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করলে তা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করবে। আর এরূপ সংবাদপত্রই সবার দাবি।

বই পড়ার আনন্দ

সূচনা : বই হলো জ্ঞানের বাহন। বই পড়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সার্বিক জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বই পড়ে মানুষ হৃদয় মনে এক অপূর্ব শিহরণ লাভ করে। জগতে জ্ঞান আহরণের দুটো পথ আছে- তার মধ্যে একটি হলো ভ্রমণ করা, অন্যটি বই পড়া। ভ্রমণ করার স্বাস্থ্য ও অর্থ সবার থাকে না। কাজেই জ্ঞান আহরণের সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো বই পড়া। বই পাঠ করে মানুষ বিশাল পৃথিবীর খবরাখবর জানতে পারে। বই পাঠ করে মানুষ জগতের প্রকৃত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সন্ধান পায়। বই পাঠ করে মানুষ জ্ঞানী হয়, সত্যানুরাগী হয় এবং সৎ ও নিষ্ঠার দীক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই বই পাঠ আমাদের জন্য আনে বিস্ময়, নীতি, সহানুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, ভক্তি-প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি।

বইয়ের উৎস : বই মানুষের জীবন সুন্দর করে। বই মানুষের সৎ চিন্তার ফসল। মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে যে অভিজ্ঞতার সম্ভার গড়ে তুলেছে, সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস হলো বই। মানুষ তার জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে এক অবর্ণনীয় শৈল্পিক রূপদান করেছে বইয়ের মাধ্যমে। প্রত্যেক সমাজে এমন লোক আছেন যাঁরা জীবন ও জগতের প্রতিটি ঘটনাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেন। আর এ উপলব্ধিজাত জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা বই রচনা করেন। তবে সবাই বই রচয়িতা হতে না পারলেও সবাই নির্দ্বিধায় পাঠক হতে পারেন। বই পড়ার মাধ্যমে সবাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন এবং অজানাকে জানার সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করতে পারেন।

বইয়ের বৈচিত্র্যঃ বিভিন্ন ধরনের বই থেকে মানুষ বিভিন্ন ধররেন আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তাই সভ্য সমাজের মানুষের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাবলির সাহচর্য। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আইন, ধর্মীয় প্রভৃতি বই থেকে মানুষ লাভ করে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান। এক এক ধরনের বই মানুষকে এক এক ধরনের আনন্দ ও জ্ঞান দিয়ে থাকে। অতীতের ঐতিহ্য, নানা অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা সংরক্ষিত হয়েছে গ্রন্থরাজির মধ্যে। এখানে এসে একত্র হয়েছে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের স্রোতধারা।

বই পড়ার গুরুত্ব : বই পড়ার গুরত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ সভ্য সমাজে বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র চলছে প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে মানুষকে অনেক কিছুই শিখতে হয়। আর এই শিক্ষা বা জানার অন্যতম উপায় হলো বই পড়া। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলায় বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন, জীবনকে সুন্দর করেছেন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন বইপ্রেমী। তাঁদের অন্যতম উপাদান ছিল বই, বই পড়া ছিল তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান কাজ।

বই পড়ার আনন্দ : বই মানুষের জীবনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস যোগায়। মানুষের এ সংগ্রামমুখর জীবনের সবক্ষেত্রে দুঃখ- বেদনার হাতছানি রয়েছে। মানুষ অবসর সময়ে বই পড়ে তার দুঃখ-বেদনা ভুলে থাকতে চায়। এমনকি বই মানুষকে জীবনীশক্তি প্রদান করতে সক্ষম। জীবনের প্রকৃত আনন্দের উৎস নির্মল আত্মা। আর বই পাঠে মানুষের আত্মা বিশুদ্ধতা লাভ করে। একটি উত্তম বই মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ দিতে পারে। কারণ বইয়ের কথাগুলি জীবন থেকে আলাদা নয় বরং জীবন সম্পৃক্ত। বই জীবনের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়েই কথা বলে। বই মানুষকে হতাশ করে না বরং আশাবাদী করে তোলে। আর এ আশাই তো জীবনের একমাত্র ভেলা। সুতরাং বই পড়ার মাধ্যমেই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং বিশুদ্ধতম আনন্দ পেতে পারে।

উপসংহার : বই মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বই পড়ে যদি কেউ আনন্দ লাভ করতে পারে তবে তার বই পড়া সার্থক। বই পড়লে মানুষের জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হয় এবং মানুষ অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে। একজন প্রকৃত বই পাঠক কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কাজেই বই পড়ে নিজে আনন্দ লাভ করতে হবে এবং বইয়ের আলোয় আলোকিত করতে হবে অন্যের জীবন। তাই কেবল পাশের জন্য নয় আনন্দ লাভের জন্য বই পড়া উচিত।

বাংলাদেশের দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

সূচনা : বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশে দুর্নীতি উন্নতির অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। শোষণহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আশা করেছিল তা আজ দুর্নীতির কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। কোনো সময় এ দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। তাই বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে দুর্নীতি দমন করতে হবে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ও ধর্মের বিধি নিষেধ বা রীতিনীতি দ্বারা মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। আর সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণকে বলে দুর্নীতি। দুর্নীতি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। এর গতি– প্রকৃতি বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে।

রাষ্ট্রীয় কাজে দুর্নীতি : অফিস-আদালতে ঘুষ বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নানা প্রকার দুর্নীতি দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এসব কথা কেবল কথাই নয়, তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ছাত্ররা পরীক্ষার হলে নকল করে পাশ করতে চায়। কেউ বুঝে নকল করে, আবার কেউ বা না বুঝে গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করে। বর্তমানে এক শ্রেণির অসাধু লোক প্রশ্ন ফাঁস করে তা কোমলমতি শিক্ষার্থীর নিকট বিক্রি করে। অভিযোগ শোনা যায় এক শ্রেণির শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন না। তাঁরা দায়িত্ব পালন না করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। অফিস আদালতে দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশে দুইভাবে দুর্নীতি হতে দেখা যায়। এক. দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার সুযোগে এবং দুই. ক্ষমতার লোভের আতিশয্যে। দুর্নীতি ছোঁয়াচে রোগের মত সংক্রামক। আর এ নীতিহীনতা যদি সমাজে একবার দেখা দেয়, তা দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আজ আমাদের

ধর্মীয় জীবন দুর্নীতিমুক্ত, রাষ্ট্রীয় জীবনের দুর্নীতি আর অফিস আদালতে এর কালো হাত আরও প্রসারিত। প্রশাসনে দুর্নীতির কথা বাংলাদেশের সবাই জানেন। যেখানে শিক্ষার আলো বিতরণ করা হয় সেখানেও দুর্নীতির কালো হাতের অশুভ ছোঁয়া বিরাজ করছে। শাসন ব্যবস্থার শিথিলতা, ক্ষমতায় টিকে থাকার মোহ, এবং ধনসম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই যুগে যুগে দুর্নীতির ভিত রচিত হয়েছে। আমাদের দেশের দুর্নীতির মূলেও এ বিষয়গুলি সক্রিয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দুর্নীতির কুফল : দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে কলংকিত করে তোলেছে। দুর্নীতি কোনো সুফল বয়ে আনে না। আমাদের দেশ দুর্নীতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বারবার। বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা দিন দিন হীন হয়ে পড়েছি। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উজ্জীবিত করতে না পারলে দুর্নীতির অশুভ হাত আমাদের উন্নয়নকে আরও গ্রাস করবে। দুর্নীতির কারণে আমাদের দেশের জ্ঞানের দরজাও প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। ধর্মজীবন মিথ্যা অহমিকার অসার আবরণে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত দুর্নীতির কালো থাবা আমাদের সার্বিক উন্নতির পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিকারের উপায় : আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতি নামক কালো বস্তুটিকে উৎখাত করা জরুরি। প্রথমে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা। মূল্যবোধ, আদর্শ ও আইনের দ্বারা দেশ শাসিত হলে দুর্নীতির মাত্রা আপনা আপনি কমে যায়। রাষ্ট্রের অধিপতিরা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব। মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা গেলে মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। প্রকৃত শিক্ষা দুর্নীতি নির্মূলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। দেশের বেকার সমস্যা দূর করে, দেশের মানুষকে সঠিক ও মানসম্মত চাকুরির ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত দুর্নীতির এ কালো হাতের ছোঁয়া যাতে কোনো ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে না পারে সে জন্য দেশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

উপসংহার : দুর্নীতি কোনো দেশকে ভালো কিছু দিতে পারে না। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতিকে দমন করতে চায়। সকল প্রকার দুর্নীতির প্রধান আশ্রয় হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশে পূর্বের ন্যায় দারিদ্র্য নেই কিন্তু দুর্নীতি রয়েছে। এ দুর্নীতিরোধে ন্যায়বান ও নিষ্ঠাবান নাগরিক দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক শাসকগোষ্ঠী। তারা দুর্নীতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সূচনা : প্রকৃতি তার নিজস্ব গতিতে চলে। প্রকৃতির গতি রোধ করা যায় না। প্রকৃতির আশীর্বাদ আমাদের দেশের মাটি ও ভূমিকে উন্নত করেছে। বন্যার পলি আমাদের দেশের মাটিকে উর্বর করে বলে ফসল বেশি উৎপন্ন হয়। তবে পৃথিবীতে যত মানুষ বাড়ছে আর ততই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে মাঝে মধ্যে প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের জনসাধারণের উপর।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ : মানুষ পরিবেশের বিনষ্টের জন্য দায়ী– একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে যে সব দুর্যোগ আকস্মিকভাবে প্রকৃতিগতভাবে ঘটে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। এ ধরনের দুর্যোগে প্রতিবছর আমাদের দেশের বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, ঘরবাড়ি ও অনেক স্থাপনা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে এবং মানবিক সাহায্যের দরকার হয়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা : বাংলাদেশে বন্যা, খরা, রোগজীবাণু অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ কেড়ে নিয়েছে অনেক বার। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশের ১৯৮৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। দেশের প্রায় জেলায় একযোগে বন্যা কবলিত হওয়ায় মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করেছিল। এছাড়া এ বন্যায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল এবং অনেক পশুপাখি মারা পড়েছিল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল বলে মানুষ প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে

ব্যাপক ক্ষতি হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রকোপ অনেক বেশি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্যায় মানুষের ব্যাপক ক্ষতি ও প্রাণহানি। খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিখাত। ফলে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিবছর বন্যা ও খরায় বাংলাদেশে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় : প্রকৃতির এ বিরূপ প্রভাব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরও অবনতি হবে। কাজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় উপায় হলো যে সমস্ত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, সে সমস্ত কাজ না করা। যেমন, মানুষ পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে বাতাসে মানুষের ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে পড়ছে এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝে মধ্যেই হানা দিচ্ছে। এরপরেও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানুষ রক্ষা করা যায়। যেমন যেসব কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা বন্ধ করে একটি পরিবেশ বান্ধব সমাজ বিনির্মাণ প্রয়োজন। জনগণকে ঘুর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য যথাসময়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করা আবশ্যক। বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী অসহায় মানুষকে সাহায্য দিয়ে তাদের মৃত্যু ও কষ্ট লাঘব করা সম্ভব। এ ছাড়া দুর্যোগের পরেও পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, দুর্যোগ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষে অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে পূর্বের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এসব দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষে বাংলাদেশে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত লোকের অভাব রয়েছে। এসব সমস্যা দূর করে দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা হ্রাস করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে পূর্বের তুলনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির পরিমাণও হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে সরকারের পদক্ষেপ আরও যথাযথ হলে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করে আবার নতুনভাবে বসবাসের পথ খুঁজে পাবে বলে সবার ধারণা।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য

ভূমিকা : বাংলাদেশ ঋতুবৈচিত্র্যের এক অপার লীলাভূমি। মূলত এই ভূ-খণ্ডে রয়েছে ছয়টি ঋতু, যা পৃথিবীতে বিরল। ছয়টি ঋতু হল– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এক এক ঋতুর এক এক রকম বৈচিত্র্য। এই ঋতুগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জীবন-জীবিকার সাথে সাথে ঋতুগুলো আমাদের আনন্দেরও উৎস হিসাবে কাজ করে। এক এক ঋতু সারা বাংলাদেশকে সৌন্দর্যে, ফুলে, ফলে, শস্য-সম্ভারে ভরিয়ে তোলে। আবার এই ঋতুর প্রভাবেই কবি মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে; জন্ম দেয় অমিয় সুধার মতো অসংখ্য কবিতা। এখানে রয়েছে যেমন গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তি, তেমনি রয়েছে শরৎ, হেমন্তের মতো আরামদায়ক ঋতু। শীত যেমন আসে জীর্ণতা নিয়ে, তেমনি বর্ষা সিক্ততায় ভরিয়ে দেয় এই ভূ-খণ্ডকে। আবার বসন্ত ভরে দেয় ফুলে ফুলে বন আর উপবন। এভাবেই ঋতু বৈচিত্র্য ধরা দেয় আমাদের সোনার বাংলাদেশে।

ঋতুবৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক কারণ : বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই বিচিত্র ঋতুতে সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের উত্তরাংশে রয়েছে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বিশাল জলরাশি বঙ্গোপসাগর। ভৌগোলিকভাবে এর ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় ঋতুর বিচিত্রতা লক্ষ করা যায়।

গ্রীষ্ম : বাংলাদেশে ঋতুচক্র শুরু হয় গ্রীষ্ম দিয়ে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মিলে গ্রীষ্ম ঋতু। এ-সময় প্রকৃতি তার রুক্ষতার দুয়ার খুলে দেয়। তখন জনজীবন থেকে শুরু করে প্রকৃতির মধ্যে নেমে আসে বিবর্ণতার ছায়া। এ-যেন এক রুক্ষ মেজাজের সন্ন্যাসী। মাঠ, ঘাট, পুকুর, নালা শুকিয়ে যায় এবং জলের জন্য এক ধরনের হাহাকার লেগে যায় প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতিকে নতুন করে সাজানের জন্যই যেন গ্রীষ্মের আপ্রাণ চেষ্টা। সে দুঃখের পরে সুখের বার্তাবাহকের মতো কাজ করে। কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি সবার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্য এক ধরনের দৃঢ়তার জন্ম দেয়।

বর্ষা : গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকে স্পষ্ট করে তোলে। বর্ষা আসে যেন সমস্তরুক্ষতাকে ধুয়ে মুছে দিতে। নির্জীব প্রাণে ফিরে আসে সজীবতার অনিঃশেষ ছোঁয়া। তখন প্রকৃতির সাথে সাথে কবি মনও যেন বৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে চায় বিশাল ব্যাকুলতায়। তাই তো 'রূপসী বাংলা'-র কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন–

এই জল ভাল লাগে;– বৃষ্টির রূপালী জল কত দিন এসে

ধুয়েছে আমার দেহ– বুলায়ে দিয়েছে চুল– চোখের উপরে
তার স্নিগ্ধ শান্ত হাত রেখে কত খেলিয়াছে,–

বর্ষা পলী-প্রকৃতি ভিজিয়ে দিয়ে নতুন সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে হাজির হয়। বর্ষায় নিচু ভূমি ডুবে যায়। নদীর দুকূল পাবিত হয়ে যায়। মনে হয় আমরা পানির ওপর ভাসছি। তাই তো ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছেন– You are water people. আবার, অতিরিক্ত বর্ষণে জন জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। এভাবেই বর্ষা মূলত বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় বহু বিচিত্রতায়।

শরৎ : ভাদ্র ও আশ্বিন মিলে দেখা দেয় শরৎ।শরতের কথা মনে পড়লে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে কাশফুল, নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা, সুন্দর মনোরম আবহাওয়ার কথা। শরতের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি তাই বলেছেন–

শরতের শোভা, বড় মনোলোভা মুগ্ধ আজিকে আঁখি,
মহা-শিল্পীকে খুঁজে খুঁজে ফেরে খাঁচায় বদ্ধ পাখি।

কবির মনে হয়, এ-যেন অলৌকিক এক শিল্পীর আঁকা প্রকৃতির ছবি। আর সেই 'মহা-শিল্পীকে'-ই যেন মুগ্ধ মানুষ খুঁজে ফেরে। এছাড়া শরৎকালে শিউলি ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্নারাত যেন তার আপন মহিমায় বাংলার প্রকৃতিকে ভরিয়ে দেয়।

হেমন্ত : কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মিলে হয় হেমন্তকাল। হেমন্তকাল সোনালি ফসলসহ যেন পূর্ণতার প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। পাকা ধান এ-সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কৃষকের মুখ হাসিতে ভরে দেয় এ-ঋতু। এ-ঋতু যেন কৃষকের সরল হাসির মতোই সুন্দর। এ-সময় শীতের আমেজ এসে ধরা দেয় বাংলার প্রকৃতিতে। এ-ঋতু শীত-সন্ন্যাসীর আগমনী বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করে। এ-সময় বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। যা বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ। তাই তো এ-ঋতুর প্রতি মানুষের মুগ্ধতার শেষ নেই।

শীত : পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত কাল।শীত বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা বয়ে নিয়ে আসে। যেন কুয়াশার চাদর দ্বারা মোড়া এক ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী। এ-সময় প্রকৃতি বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছের পাতা খসে পড়ে যায়। সূর্য যেন মুখ ফিরিয়ে নেয় প্রকৃতি থেকে। এ-ঋতু ধনিদের জন্য যতটা আরামের গরিবদের জন্য ততটা আরামের নয়। কারণ, গরিব মানুষ গরম পোশাকের অভাবে দুর্ভোগ সহ্য করে। ধনিদের মধ্যে মানবতা ও সহানুভূতির একটা নমুনা বোঝা যায়, যখন তারা শীতার্ত গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ায় গরম কাপড় নিয়ে। এ-ঋতুতে অনেক শাক-সবজি পাওয়া যায়, যা আমাদের শরীরে ভিটামিনের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করে।

বসন্ত : বসন্ত যেন ফুলের সবুজ পাতায় ভরে ওঠার, নতুনের বার্তা নিয়ে আসার ঋতু। একে বলা হয় ঋতুরাজ। তাই তো কবি এ-ঋতুর কথা বলতে গিয়ে বলেন–

জরাজীর্ণতা কুহেলিকা ভেদী আসিয়াছে ঋতুরাজ।
তার আগমনে বন-উপবন ধরিয়াছে নব সাজ।

এ-ঋতুতে প্রকৃতি যেন বিচিত্র ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। চারিদিকে যেন ফুলের মেলা। আর আমরা হয়ে উঠি তার মালি। দখিনা বাতাস বাতাবি নেবু, আমের মুকুলের গন্ধে অধীর আকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুলের লালে চারিদিকে যেন নান্দনিক আগুন ধরে যায়। কোকিল তার আপন মহিমায় গেয়ে ওঠে আগমনী গান। এভাবেই বসন্ত তার রূপ, রস, গন্ধ ঢেলে দেয় প্রকৃতি মাঝে। প্রত্যাশা দীর্ঘ হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই এই ঋতু স্থায়ী হয় ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস।

উপসংহার : ঋতুর নানা বিচিত্রতায় বাংলাদেশ যেন একটি চলচ্চিত্রের মতো হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ঋতু যেন চলচ্চিত্রের এক একটি রঙিন দৃশ্য। এক এক রূপ নিয়ে এক এক ঋতু আসে আর যায়। প্রতিটি ঋতু মেজাজে ভিন্ন। গ্রীষ্ম যেমন রুক্ষতার প্রতীক, বর্ষা তেমনি সিক্ততার প্রতীক। শরৎ যেমন স্নিগ্ধতার প্রতীক, হেমন্ত তেমনি পূর্ণতার প্রতীক। শীত যেমন বিবর্ণতার প্রতীক, বসন্ত তেমনি সজীবতার প্রতীক। এই বৈচিত্র্য বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রে এনেছে বিশিষ্টতা। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ফুটে আছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের একটি বৃন্তে ছয়টি ঋতু।

শীতের একটি সকাল

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমি স্বভাবতই আর দশটা ছেলে-মেয়ের মতোই দুরন্ত ছিলাম। পল্লীর শীতের সকালের সঙ্গে আমার সেই দুরন্তপনা নানাভাবে জড়িয়ে আছে। তখন সকালে উঠে খেজুর রস খাওয়ার জন্য গিয়ে দাঁড়াতাম মায়ের পাশে। কখনো বা চলে যেতাম পুকুরের ধারে খেজুর গাছের পাশে, যেখানে গাছি তার বিশেষ কৌশলে হাড়ি ভর্তি রস নিয়ে গাছ থেকে নেমে আসত। তারপর রস নিয়ে আসলে আমরা দুরন্ত ছেলেমেয়েরা পাটকাঠির নল দিয়ে রস খেতাম আর বৃদ্ধ মানুষের মতো ঠকঠক করে কাঁপতাম। আবার কখনোবা বাড়ির পাশেই রোদে পিঠ ঠেকিয়ে তুলতে যেতাম মটরশুঁটি। এভাবে আমার ওই বয়সের শীতের সকাল নানা দুরন্তপনা আর আনন্দে ভরা থাকত। তবে শীতের একটি বিশেষ সকাল আমার স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে।

আমার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক এবং আপাদমস্তক একজন কবি ও সুপণ্ডিত। তিনি প্রায়ই আমাকে মধুমতি নদীর কূলে বা বিলের ধারে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। একই ধারাবাহিকতায় বাবা একদিন এক শীতের খুব সকালে আমাকে ডাকলেন। আমি এবং বাবা হাঁটতে হাঁটতে সেই শীতের সকালে গেলাম বিলের দিকে। অবশ্যই যেতে হলো খালি পায়ে। কারণ, বাবা বলতেন, 'সকালের শিশির খালি পায়ে স্পর্শ করা চোখের দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী।' বাবা আরো বলতেন, 'সকালবেলার হাওয়া, হাজার টাকার দাওয়া।'

সেই সকালে বাবা আমার হাত ধরে বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন গ্রামের বাইরের বিলের মধ্য দিয়ে যাওয়া শিশির ভেজা মেঠো পথ ধরে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাবা শিশিরের স্পর্শ নিয়ে বললেন দেখো দেখো, 'অরুণ কিরণে শিশির বিন্দু মুক্তার মতো ঝিকিমিকি করছে।'

আমি বাবাকে বললাম, 'এর মানে কী?'

বাবা বললেন, 'অরুণ মানে সূর্য। কিন্তু এটি সকালের সূর্য। তার কিরণে শিশির বিন্দু যেন মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করছে।'

সত্যি তাই। দুর্বা ঘাসের সবুজ কার্পেটে মোড়ানো রাস্তার সামনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মনে হলো আমরা যেন মুক্তা বিছানো এক রাস্তার মাঝ দিয়ে হেটে যাচ্ছি।

আমি চারিদিকে লক্ষ করলাম। দেখলাম, পূর্বদিকে এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, যেন ভেজা কুয়াশার স্তর ভেদ করে কোনো উষ্ণতার খোঁজে। আমি বিলের ধারে কিছু অপরিচিত পাখি দেখে বাবাকে বললাম, 'এ-পাখিগুলো তো আগে দেখিনি।'

বাবা বললেন, 'এরা অতিথি পাখি। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে বা আরো ঠাণ্ডার দেশ থেকে এসেছে।'

বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'সাইবেরিয়া কোথায়?'

বাবা তখন তাঁর ভূগোলের বই যেন আমার সামনে তুলে ধরলেন। আর আমি সুবোধ ছাত্রের মতো তা গ্রহণ করতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে দু-একটি পানকৌড়ি দেখলাম বিলের কচুরিপানার মধ্যে। তারা এই ভোরে জনশূন্য রাস্তায় আমাদের দেখে যেন অবাক হয়ে গলা বাড়িয়ে তাকালো। আবার একটু ভয়ও যেন পেল বলে মনে হল। তবু তারা উড়ল না। আবার ঘাপটি মেরে থাকল শীতের প্রচণ্ড প্রতাপে।

দেখলাম দূর্বা ঘাসের কার্পেটে মোড়ানো পথের একপাশে মটরশুঁটির ডগার ওপর শিশিরের বিন্দু। মনে হলো মটরশুঁটি যেন মুক্তার অলংকার পরে আছে।

বাবার হাত ধরে কবি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্‌দীনের কথা শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরে দেখি ভাপা পিঠার সমারোহ। মা আমাদের পিঠা খেতে দিলেন। আমরা পরিবারের সবাই মিলে বারান্দায় পাটি পেতে পিঠা খেতে থাকলাম, যেন সবাই মিলে এক ফালি মিষ্টি রোদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পিঠা খাচ্ছি। সেই স্মৃতি, সেই মধুরতা, সেই অমৃত বচন, সেই শীতের সকাল আর কি ফিরে পাব!!

ঝড়ের রাত

আমাদের দেশে ঝড় কোনো পুরাতন বিষয় নয়। এটি ঋতু চক্রের সাথে সাথে এসে আমাদের জন জীবনে এক গভীর রেখাপাত করে যায়। ঝড়কে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। গ্রামাঞ্চলে বাড়ি অথচ ঝড়ের স্মৃতি নেই এমন মানুষ বোধ করি পাওয়া মুশকিল হবে। তবে সেই ঝড়ের স্মৃতি যদি হয় রাতের, তাহলে তা হয়ে ওঠে একটু ভীতিকর। আমার স্মৃতিতে রয়েছে এমনি এক ঝড়ের রাত। পরে জেনেছি ওই রাতের ঝড়টি ছিল স্মরণকালের ভয়াবহ ঝড়গুলোর অন্যতম।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আমি গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করি। যথারীতি গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। দুই-তিন দিন ধরে প্রচণ্ড গরমে কাটল। এত গরম যে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতিতে এতটুকু বাতাসও ছিল না। প্রকৃতির মধ্যে সন্ন্যাসীর গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল।

সকালবেলা বাবা বললেন, 'নিশ্চয় কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে।'

বাবাকে বললাম, 'নিম্নচাপ হলে তো ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে!'

বাবা বললেন, 'ঠিকই বলেছ। আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দেখছ না প্রকৃতি কেমন সন্ন্যাসীর মতো যেন দম বন্ধ করে আছে। অচিরেই সে তার দম ছাড়বে তীব্র বেগে। কতক্ষণ আর দম বন্ধ করে রাখবে বল? ঝড়-বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।'

তীব্র গরম আর গুমোট আবহাওয়ায় আমাদের বিকেলবেলার খেলাটা সেদিন ভালো জমল না। খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলাতেই দেখলাম উত্তর পশ্চিমাকাশে কালো মেঘের আবরণ; একটু হাওয়াও বইছে। মা বললেন, 'মনে হয় ঝড় হবে। কোথাও যেন যেও না।' আমি বাড়িতে আছি। বাবা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। আমরা ভাই-বোন এক সাথে বাড়িতে। একই ঘরে অবস্থান করছি।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। রাত যত গড়াতে লাগল বাতাস ততো প্রবল বেগে বইতে শুরু করল। প্রথমে একটানা বাতাস এবং ক্রমে তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিতে লাগল। ঝড়ের তীব্রতা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতটা বাড়তে লাগল যে, মনে হচ্ছিল যেন সব ভেঙে-চুরে নিয়ে যাবে। ঝড়ের তীব্রতার সঙ্গে ছিল মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, আমাদের উঠানের পাশের দেবদারু গাছ মাঝে-মধ্যেই প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কে যেন গাছটিকে জোর করে ঘাড়ে ধরে তার মাথা মাটিতে চেপে ধরছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, আবার চেপে ধরছে। ঘরের কাছে কাঁচা-মিঠা আম গাছ থেকে প্রচুর আম পড়ে যাচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি। অন্যদিন হলে আম কুড়ানোর লোভ হোতো। কিন্তু আজ সেকথা একবারও মনে এল না। কারণ ঝড়ের তীব্রতায় আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

আমরা যে-ঘরে ছিলাম, তা টিনের চালা এবং শক্ত কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ছিল। তা যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মনে হচ্ছিল কে যেন উপর থেকে ঘরের চাল ধরে টান দিচ্ছে। বাবা মাঝে-মধ্যে ঘরের শক্ত কাঠের খুঁটি ধরে দেখছিলেন তা নড়ে কি না। এবং বাবা দেখলেন খুঁটিও মাঝে-মধ্যে নড়ে নড়ে উঠছে। এতকাল আমরা আমাদের যে ঘরটিকে অনড় আর নিরাপদ মনে করতাম, সেই ঘরটিকেও আজ দুর্বল মনে হতে লাগল। মা দোয়া পড়তে থাকলেন। বাবা আমাদের কী করতে হবে ঐ মুহূর্তে তা বলে দিচ্ছিলেন। আমরা পাশের বাড়ি থেকে কান্নার চিৎকার শুনতে পেলাম। তারা ছিল দরিদ্র, তাই তাদের ঘর অতটা শক্ত ছিল না। তখন আমার বাবা তাদেরকে আমাদের ঘরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য চিৎকার করে আহবান করলেন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশের বিদ্যুতের আলোই তখন ভরসা। এমন অবস্থায় প্রতিবেশী কয়েকজন ছেলে-বুড়ো আমাদের বাড়িতে ওই ঝড়ের মধ্যে ছুটে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। শোনা গেল তাদের ঘরের চালা উড়ে গেছে। এবং আশেপাশে বেশ কিছু গাছ পড়ে অবস্থা আরো বেগতিক। এরমধ্যে মাঠের মধ্যে বাড়ি বানানো লোকজন ছুটে এসে আমাদের কাছারি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। টানা তিনঘণ্টা তীব্র ঝড়ের পর যখন বাতাসের বেগ থেমে গেলে দেখা গেল,

আমাদের বাড়ির পাশের সব আমগাছ থেকে সব আম ঝরে গেছে, নারিকেল পড়ে গেছে, তিন চারটি মেহগনি গাছ পড়ে গেছে। বাড়ির পাশের সবচেয়ে বড় আমগাছটি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে গেছে। এটি ছিল আমাদের কাছে অভাবনীয়। আমগাছটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বীরের মতো। যারা আশ্রয় নিতে এসেছিল তাদের জন্য কিছু শুষ্ক খাবারের ব্যবস্থা করলেন মা।

সকালে দেখা গেল চারিদিকে ঘর-বাড়ি, গাছপালা পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রামে অনেকের গবাদি পশু মারা গেছে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। মনে করা হয় এটি ছিল স্মরণকালের কালবৈশাখী ঝড়গুলোর অন্যতম। যা আমার স্মৃতিপটে এখনো দাগ কেটে আছে।

নৌকায় ভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতা

ভূমিকা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। যার অর্থ নদী মাতা যার। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক যে ভূ-খণ্ডটি আছে, তার মা হলো এই নদী। কেননা বাংলাদেশ হলো নদীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া একটি ভূ-খণ্ড। সংগত কারণেই নদীতে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে বহু প্রাচীন কাল থেকে আমরা ব্যবহার করি নৌকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী আর নৌকা বাঙালির গর্বিত উত্তরাধিকার। যে-বাংলাদেশের মানুষের রক্তে মিশে আছে নদী আর নৌকা সেখানকার মানুষের জন্য নৌকা ভ্রমণ কতটা আনন্দের তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমি গ্রামে জন্ম নেওয়ায় নদী ও নৌকার সাথে রয়েছে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একদিনের নৌকা ভ্রমণ এখনও আমার স্মৃতিপটে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। নৌকা ভ্রমণের সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগুলোর অন্যতম।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমাদের স্কুল থেকে মধুমতি নদী ভ্রমণ এবং বনভোজনের উদ্দেশ্যে একটি আয়োজন করা হয়।

যাত্রার বিবরণ : তখন ছিল শরৎকাল। সবেমাত্র বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। সকালের আকাশে ঝলমলে রোদ আরামদায়ক আবহাওয়া। আমি কয়েকদিন যাবৎ এ-বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত ছিলাম। যাত্রার আগের রাতে প্রায় ঘুমই হয়নি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে সোজা স্কুলে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সব বন্ধু এসে পৌঁছেছে। সবার মধ্যে টান টান উত্তেজনা। আমরা বড় একটা নৌকা ভাড়া করেছিলাম সারাদিন ঘোরার জন্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী সাথে ছিলেন।

সকাল নয়টায় আমরা নৌকায় উঠে নাস্তা করে যাত্রা শুরু করলাম। পূর্ব দিগন্তে সূর্য পরিষ্কারভাবে কিরণ দিচ্ছিল। আমাদের নৌকা যখন কূল ধরে চলছিল, লক্ষ করলাম, আমাদের নৌকার পালে বাতাস লেগেছে। মৃদু-মন্দ বাতাসের সাথে সাথে দুকূলে কাশফুলের দোল খাওয়া দেখে আমার মন ময়ূরের মতো নেচে উঠল। রাশি রাশি জল মৃদু-মন্দ বাতাসে সামান্য ঢেউ সৃষ্টি করে আমাদের নৌকাকে দোলাচ্ছিল। এদিকে নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল ভিনগ্রহ থেকে পরীরা এসে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ চোখ ভরে উপভোগ করছে। দূরে দেখলাম সাদা গাঙচিল, মাছরাঙা, দু-একটি বক মাছের সন্ধানে উড়াউড়ি করছে। এগুলো যেন নদীর সৌন্দর্যকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। অসংখ্য মাছ ধরার নৌকা দেখলাম। সেসব নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে; রূপালি মাছ। এছাড়া নদীর ঘাটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খালি গায়ে গোসল করছে আর লাফালাফি করছে। এ-যেন তাদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। গ্রামের বধূরা এখানে এসেছে জল নিতে এবং গোসল করতে। তাদের কলসি কাঁখে চলা যেন আবহমান বাংলার চিরন্তন দৃশ্য। তখন আমার বিখ্যাত ঐ গানটির কথা মনে পড়ে গেল–

এখানে রমণীগুলো নদীর মতো,
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

হঠাৎ করে আমার এক বন্ধু শুশুক দেখে অনেকটা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমাদের এক শিক্ষক বোঝালেন যে, এ-প্রাণীটি ক্ষতিকর নয়। তারা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য পানির উপরে নাক উঁচিয়ে ধরে। নদীর ধারে ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে ছাড়া আর কোনভাবে উপভোগ করা যায় কি না আমার জানা নেই।

আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য নদীর তীরের একটি বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘাটে নৌকা বেঁধে খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবার আমরা ফিরলাম নদীর অন্য তীর দিয়ে। ফেরার সময় যে তীর দিয়ে আসলাম সেই তীর ঘেঁষে ছিল সবুজ ফসল। সে-সবুজ ফসল বাতাসে দোল খাওয়ার সাথে সাথে মনে হলো যেন

কৃষকের হাসি দোল খাচ্ছে, যা সত্যি অপূর্ব। চোখে না দেখলে তার মর্ম বোঝা যাবে না। ফেরার পথে নদীর দুকূলে সারি সারি সবুজ গাছ দেখে মনে হল কবির সেই গানের কথা–

সবুজ শাড়ি পরি কত না নারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে তারা সারি সারি।

এভাবে সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে এল, নদী যেন তার মৃদু-মন্দ ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ আরো বাড়িয়ে দিল আমাদের শীতল করার জন্য। মনে হল, নদী সত্যিই মায়ের মতো; অতি আদরে-যত্নে যেন আমাদের সন্তান-স্নেহে লালন পালন করছে আবহমান কাল ধরে।

উপসংহার : নৌকা ভ্রমণ না করলে হয়ত বুঝতাম না নদী কতটা নির্মল, কতটা মিত্র। আমাদের বাঙালির জাতিসত্তার সাথে নদীর মিলন যেন বহুকাল ধরে। তাই প্রকৃতির খুব কাছাকাছি যেতে নৌকা ভ্রমণের কোন দ্বিতীয় বিকল্প আছে কি না আমার জানা নেই।

আমার জীবনের লক্ষ্য

ভূমিকা : মহাকাল ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সেই তুলনায় মানুষের জীবন ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে এর ব্যাপ্তি খুব একটা কম নয়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি যুক্ত হয়ে অসংখ্য মানুষের কীর্তির ফলেই সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতার উৎকর্ষ। কিন্তু এই মানব জীবনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করা মানে হল মরুভূমিতে বালুর চাষ করার সমান। তাই জীবনের শুরুতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অর্থাৎ শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে চলার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন কেন : ছেলেবেলায় শিশুরা যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে অনিঃশেষ মুগ্ধতার পাশাপাশি জন্ম নেয় স্বপ্ন। কেউ মহান আবিষ্কারকের আবিষ্কারের কথা জেনে হতে চায় আবিষ্কারক, আবার কেউ হতে চায় কবি সাহিত্যিকের মতো গুণী, উড়োজাহাজ দেখে কেউ হতে চায় পাইলট। নানামুখী স্বপ্ন তার সামনে হাতছানি দেয়। কেননা স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবনানন্দের ভাষায় বলতে হয়– 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।'আর এই স্বপ্নের হাত ধরেই মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। এই স্বপ্ন বা লক্ষ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমিও আমার জীবনের একটি লক্ষ্য বেছে নিয়েছি। তা হলো আমি ডাক্তার হব। জনসেবাই হবে আমার ব্রত।

চিকিৎসক হতে চাওয়ার কারণ : বাংলাদেশ একটি ছোট অথচ জনবহুল দেশ। এদেশে চিকিৎসাসেবা পাওয়া যেন এক মহা দুর্লভ বস্তুর মতো; বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে। আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা কম হওয়ায় গ্রামের গরিব অনেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অথচ চিকিৎসার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া এক শ্রেণির চিকিৎসকের মধ্যে এখন ব্যবসার মানসিকতা ঢুকে পড়েছে। ফলে বড় বড় চিকিৎসকদের নাগাল পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। যে-কারণে মানবসেবার ব্রত নিয়ে মানবসেবার বাতিঘর হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাই।

জীবনের লক্ষ্যে করণীয় : আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া বরাবরই আমার গণিতশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রতি আলাদা দুর্বলতা রয়েছে। আমি বরাবরই বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। নানা আবিষ্কার ও প্রাণিবিদ্যার নানামুখী গবেষণায় আমার আকর্ষণ থাকায় পরিবারের সম্মতিতে নবম শ্রেণিতে আমি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি। মাধ্যমিক স্তর পাশ করার পর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে আমি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব। সেখানে আমার বাধ্যতামূলকভাবে জীববিদ্যা পড়তে হবে। আমি যদি পাঠ্যবই ভালমতো বুঝে পড়তে পারি তবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আমি সাফল্যের কৃতকার্য হব বলে আশা রাখি। তারপর ভালভাবে চিকিৎসাবিদ্যা পড়া শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে যেকোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে মেলে ধরব।

জনসেবা ও কর্মজীবন : জীবন যদি একটি বৃন্ত হয় তবে জনসেবা ও কর্মজীবন হলো সেই বৃন্তের দুটি সুবাসিত ফুল। এদিক বিবেচনায় বলা যায়, চিকিৎসা বিদ্যায় যতটা জনসম্পৃক্ত হয়ে সেবা করা যায়, অন্য পেশায় এ-সুযোগ খুবই কম। আমি

গ্রামের সহজ-সরল এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চাই। কারণ ত্যাগের মধ্যেই চূড়ান্ত সুখ নিহিত। সুখ সম্পর্কে কবির এই চিন্তা সঠিক বলেই আমি মনে করি–

ত্যাগে ধরা দেয়, বিলাসে পালায়,
এমনই স্বভাব তার

তাই ত্যাগ ও সেবার মহান্‌ব্রত নিয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে পারলে সেটিই হবে চরম সার্থকতা। এছাড়া, আমি গ্রামে চিকিৎসাসেবার একটি পদ্ধতিগত মডেল তৈরি করতে চাই, যাতে চিকিৎসা-বঞ্চিত গ্রামের মানুষ পেতে পারে যথাযথ চিকিৎসা সেবা।

উপসংহার : প্রত্যেক পেশারই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। তেমনি চিকিৎসাপেশা শুধু একটি পেশাই নয়, এর অন্তরে রয়েছে বিশিষ্টতা যা অন্য পেশায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখানে জনসেবা বা মানবসেবার পাশাপাশি রয়েছে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। তাই আমি ডাক্তার হতে চাই। এটি আমার ব্রত বা লক্ষ্য।

একটি নদীর আত্মকথা

আমি নদী পাষাণের বুক চিরে যেন তার স্নেহধারা হয়ে, বিস্তীর্ণ সমতলে বয়ে চলেছি মহাসমুদ্রের দিকে। সেখানেই আমার মিলন, সেখানেই আমার মরণ এবং সেখানেই আমার পূর্ণতা। আমার বুকে নিয়ে বয়ে চলা পলল দ্বারাই বাংলাদেশের জন্ম।

বহমানতাই আমার ব্রত। আমি দুকূল পাবিত করে পলিমাটি নিয়ে বয়ে চলি বাংলার বুক চিরে। আর গঠন করি ভূমি। সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ভূমির বুক। আর হাসি ফোটে করুণ কৃষকের মুখে। ভাঙা-গড়া আমার ধর্ম। কখনো বিস্তৃত চর জাগিয়ে তুলি, আবার কখনো বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ভেঙে একাকার করি। কারণ, এটি হলো আমার স্বাভাবিক প্রবণতা। আমি বয়ে চলি এবং চারপাশে পলিমাটির প্রভাবে ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। কবির কবিতায় যেন আমার কথাই ধ্বনিত হয়। তাই তো কবি বলে থাকেন–

সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা
সোনার বাংলাদেশ।
যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই
সবুজ বরণ বেশ।

এটি আমার গুণেরই যেন পরোক্ষ প্রকাশ।

আমার বুকের ওপর দিয়ে চলে কত মালবাহী জলযান, মাঝি গেয়ে যায় গান। লঞ্চ জাহাজ চলে দাপটের সাথে। আমার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে হাট-বাজার, গঞ্জ-গ্রাম, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। সাদা বক, গাঙচিল, মাছরাঙা আমার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। আমি তাদের বেঁচে থাকার প্রধান সহায় হিসেবে কাজ করি। জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আমি কখনো রুদ্র রূপ ধরণ করি, আবার কখনো শান্ত নির্মল রূপ ধারণ করি। আমার চরিত্রের মধ্যে আছে কঠোরতা ও কোমলতার এক অসামান্য রসায়ন। আমিই জনপদ গড়ে তুলতে সহায়তা করি, আবার তা ভেঙে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। কারণ আমার ওপর মনুষ্যসৃষ্ট নানা অত্যাচার হয়ে থাকে। ভূমি-দস্যুরা আমার বুকের ওপর মাটি ভরাট করে গড়ে তোলে স্থাপনা, আমার বুকের মধ্যে ফেলে দেয় নানা রকম বর্জ্য পদার্থ, আমার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব করে তোলে বিলুপ্ত প্রায়। আমাকে নিয়েই আবার রচিত হয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য। চলাই আমার ধর্ম। আমি সদ্য বিবাহিতা পলিবধূর মতো এঁকেবেঁকে চলি। তাই তো আমাকে নিয়ে কবি লিখে যান–

এখানে রমণীগুলো নদীর মতো,
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

আমার স্বাভাবিক বহমানতায় সাহায্য করলে আমিও আমার দুকূলের জনপদ, জীববৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখব। কারণ, আমাকে আঘাত না করলে আমিও আঘাত করব না।

আমি বহুপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমার চলার ছন্দ আছে। চলার ছন্দে নৃত্য করতে করতে যাওয়ার মাধ্যমে আমি চারপাশ সুজলা-সুফলা করে গড়ে তুলতে চাই। এটিই আমার প্রত্যয়।

দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ভূমিকা : বলা হয় Knowledge is Power। অর্থাৎ 'জ্ঞানই শক্তি'। আর এই অমিত শক্তির ধারক হয়ে উঠতে পারে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে, এই তারুণ্যই পারে পুরো সমাজ-রাষ্ট্রের চেহারা বদলে দিতে। কেননা ছাত্র সমাজই আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার কাণ্ডারি হিসেবে কাজ করবে। তারাই পারে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিকে রুখে দিতে। তারা সুন্দর গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে সমস্ত আগামী পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে পারে। সেজন্য অর্জন করতে হবে প্রকৃত শিক্ষা এবং লক্ষ রাখতে হবে অটুট। তা না হলে সমস্ত পরিশ্রম যে মরুভূমিতে বালুর চাষ করার মতো হবে।

ছাত্রসমাজের অতীত ইতিহাস : ছাত্রসমাজ বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এই ছাত্ররা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ভাষার মান রক্ষা করেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ১৯৬২ সালে শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আসাদের মতো কত শত তরুণ ছাত্র বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনে স্বৈরাচার পতনের ক্ষেত্রে ছাত্ররা ছিল অগ্রগণ্য। ইতিহাসের এই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে, ছাত্ররা জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশ ও জাতির মান রক্ষা করেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে ছাত্ররা আগামী দিনে দেশ গঠনে গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করবে। কেননা মনে রাখতে হবে, যার গৌরবময় অতীত নাই, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনেকটা ফিকে হয়ে যায়।

দেশের সমস্যা সমাধানে ছাত্রসমাজের করণীয় : মাঝে মাঝে নানামুখী সমস্যা সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের মধ্যে। সামাজিক অবক্ষয়, কুসংস্কার, দুর্নীতি, হানাহানি, মারামারি, গণতন্ত্রের অবক্ষয় নানামুখী সমস্যা এসে ভিড় করে। কেননা, সব সময় একটি রাষ্ট্রের বা দেশের অবস্থা শুধু উৎকর্ষ থেকে উৎকর্ষের দিকেই ধাবিত হয় না, অপকর্ষের দিকেও যায়। ফলে এ-সময় ছাত্রসমাজ পারে তাদের সর্বোচ্চ চেতনা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে এসব সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। কারণ, ছাত্রসমাজ থাকে সকল প্রকার স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে। ছাত্রসমাজ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির সাথে সংযুক্ত না হয়ে, প্রগতিশীল চিন্তা নিয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের ভুলগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের ইতিহাস পাঠে মনোযোগী হতে হবে। তারা বিশ্ব-ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমে বর্তমানের ভুলগুলোকে শুধরে দিতে পারবে। কেননা, ছাত্রদেরও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দীর্ঘ ইতিহাস। প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে রয়েছে জাতিগঠনে সেই ব্যাপক সম্ভাবনা। ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি ছাত্র হলো এক একটি বাতিঘর, আলোর দিশারি।

দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের করণীয় : ছাত্র জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম পড়াশুনা করা। কেননা, পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সব রকম অন্ধকার দূর করা সম্ভব। ছাত্ররা সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করার জন্য সচেতনতামূলক কাজ পরিচালনা করতে পারে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের হাতে অফুরন্ত সময় থাকে। তারা গণশিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে। ফলে শিক্ষার আলোয় সবাই উদ্ভাসিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন– 'শিক্ষা হলো পরশ পাথরের মতো, আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাই সংস্কৃতি।' এভাবে ছাত্রসমাজ সমাজ ও রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটাতে পারে।

পাড়ার কোন জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা দেখলে তা পরিষ্কার করা এবং এ-বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ছাত্ররা অগ্রণী হতে পারে।

কোথাও কোন দুর্নীতি অনিয়ম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করা এবং যথার্থতা সম্পর্কে গণমানুষকে বোঝাতে পারে। এবং এ-ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারে।

কোন এলাকায় মাদকের ব্যবহার বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে খবর দেওয়া বা তাদের এ-ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করা বা বোঝানো ছাত্রদের দায়িত্ব। কেননা ছাত্ররা হলো জাতির বিবেকের একটি বড় অংশ।

এছাড়া, কোথাও কোন মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলে ছাত্ররা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লে এরকম সমস্যা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব।

ছাত্ররা নারীর ক্ষমতোয়ন, নারীশিক্ষা, লিঙ্গ-সমতা বিধানে সব সময় সোচ্চার থাকবে। এভাবেই একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠন করা সম্ভব।

ছাত্রসমাজ অবসর সময়ে কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কৃষির নতুন নতুন দিক শিখতে পারে। কেননা ভুলে গেলে চলবে না, গ্রামে প্রায় ৮০% লোক বসবাস করে এবং তাদের অধিকাংশ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে সবুজ বনায়ন গড়ে তুলতে পারে। কারণ, যেভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। এভাবে প্রতিটি স্তরে ছাত্রসমাজ পারে দেশের সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করতে।

উপসংহার : ছাত্রসমাজ একটি দেশের সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি। ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করা শিক্ষকদের দায়িত্ব। সততা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাকার সুকুমার বৃত্তি জাগিয়ে তুলতে পারলে সমাজের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে নিমিষে। এই কাজটি সহজেই করতে পাওে ছাত্রসমাজ। দেশ ও সমাজকে সুখী সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা : পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের সাথে শ্রম একটি অনিবার্য বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়ে আছে।। শ্রমের দ্বারা তিল তিল করে গড়ে উঠেছে এই সুবিশাল মানবসভ্যতা। এই শ্রমের কল্যাণে আমরা সভ্যতাকে এতদূর নিয়ে আসতে পেরেছি। এই বিশ্বসভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে কায়িক শ্রম এবং মেধাগত শ্রমের মাধ্যমে। ফলে শ্রমের উভয় শাখাই সমান মর্যাদার দাবি রাখে। কায়িক বা মেধাগত যে-রকমেরই হোক, উন্নতির সোপান হল শ্রম। একারণেই বলা হয় Industry is the key to success।

যুগে যুগে শ্রমের মহাকাব্যিক ঐতিহাসিকতা : মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রাত দিন সমান পরিশ্রম করেছে। এই প্রজন্মের পর প্রজন্মের যে শ্রম, তা দিয়ে রচিত হয়েছে এই মহাকাব্যিক সভ্যতা। বিখ্যাত মনীষী কার্ল মার্কসের মতে– 'শ্রমজীবীরাই সভ্যতা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।' কিন্তু প্রথম দিকে এই শ্রমজীবীদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা শুধু ক্রীতদাস ছিল এবং প্রভুর কথা মতো কাজ করত। কথা না শুনলে প্রহার করা হতো। পরবর্তীতে ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা কৃষকদের সাথে দাসের মতো ব্যবহার করত। এরপর ইউরোপে হল শিল্প-বিপ্লব। এই শিল্প-বিপ্লবের প্রধান নিয়ামকও ছিল শ্রমিক-শ্রেণি। কিন্তু তারাও হয়েছে নানাভাবে নিষ্পেষিত। অবশ্য এরই মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে শ্রমিকের মর্যাদা। এছাড়া বলশেভিক বিপবের মাধ্যমে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান উঠেছিল। তার ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। আমরা প্রতিনিয়ত শ্রমের মর্যাদার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি।

শ্রমের অবদান : পৃথিবীর ইতিহাস বিনির্মাণে শ্রমিকের অনিঃশেষ শ্রমের মহিমার অবদান অনস্বীকার্য। শ্রম কেবল সমৃদ্ধিই ডেকে আনে না, তা মানুষকে দেয় সৃষ্টিশীলতার সুখ এবং নির্মাণের অপরিসীম আনন্দ। মানুষ এই শ্রমের দ্বারা করেছে বড় বড় আবিষ্কার। পৃথিবী ছিল এক সময় অন্ধকারময়। এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে এডিসনের নিরলস পরিশ্রমের ফলে। তাই ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। শ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর সব আশ্চর্যজনক কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, যেমন– ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান, তাজমহলের মতো এত বড় কীর্তি সম্ভব হয়েছে মানসিক এবং কায়িক শ্রমের মাধ্যমে। এছাড়া, চাঁদে যাওয়ার মতো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে শ্রম এবং অদম্য নিষ্ঠার দ্বারা। প্রবাদে আছে– পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পৃথিবীতে যত সাফল্য এসেছে তা কেবল পরিশ্রমের মাধ্যমে এসেছে। শ্রম ছাড়া কোনো মহান সৃষ্টিকর্মই সম্ভব ছিল না।

সর্বপ্রকার শ্রমের মর্যাদা : শ্রম প্রধানত দুই প্রকার হয়ে থাকে– মানসিক বা মেধাভিত্তিক শ্রম এবং কায়িক শ্রম। পৃথিবীতে কেবল একমুখী শ্রম দিয়ে কোন মহান কর্ম সুসম্পন্ন হয়নি। মানসিক শ্রম বা মেধাভিত্তিক শ্রম সরল রেখায় চলে না, যেমন- কোন মহান চিন্তাকে যদি আমি বাস্তবে পরিণত করতে চাই তবে আমাকে কায়িক শ্রমের মুখোমুখি হতে হবে। তা ছাড়া

সম্ভব নয়। তাজমহল তৈরীর ক্ষেত্রে যে প্রকৌশলী কাজ করেছিলেন তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রায় দুই যুগ অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে নির্মাণ শ্রমিকদের। ফলে বলা যায়, এ দুই ধরনের পরিশ্রমে ফুটে ওঠে ফুল। আর সেই ফুলের সুবাস উপভোগ করে বিশ্ববাসী। তাই যেকোনো সৃষ্টি কর্মের পিছনে প্রয়োজন দুই ধরনের শ্রমের রসায়ন। তবেই সৃষ্টি হয় মহান সৃষ্টি কর্ম।

কেন শ্রম মর্যাদাশীল : কেউ যদি শুধু প্রার্থনা করে যে আমাকে শস্য দাও, তবে সে তা পাবে না। আর যদি প্রার্থনার সাথে সাথে পরিশ্রম করে তবে শস্য পাবে। আবার যদি শুধু পরিশ্রম করে তবে শস্য পাবে। ফলে শ্রম কখনো বিফলে যায় না। এর রয়েছে অনিঃশেষ সুফল। বড় বড় মনীষী প্রমাণ করেছেন, পরিশ্রম করে যে-কোন প্রকার অসাধ্যকে সাধ্যে পরিণত করা সম্ভব। অনেক মনীষী বলে থাকেন, অনিঃশেষ পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই প্রতিভাবান হয়ে ওঠা যায়। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু জাতীয় জীবনে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নাই। মৌমাছি ক্ষুদ্র প্রাণী। দূর-দূরান্ত থেকে মধু সংগ্রহ করে তারা মৌচাক গড়ে তোলে। এতেই তাদের মর্যাদা, এতেই তাদের আনন্দ। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ আমরা সমাজ-জীবন থেকে গ্রহণ করে শ্রমকে মর্যাদার শীর্ষে তুলে ধরতে পারি।

উপসংহার : পৃথিবীর ইতিহাস শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস। কেননা মাঠের করুণ কৃষক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সবাই যেন শ্রমের এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা বা অন্যকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই। এই শ্রমজীবী মানুষের হাতের পরশে পৃথিবী হয়ে উঠেছে স্বর্গের মতো। তাই শ্রমের মর্যাদা যুগে যুগে অক্ষুণ্ন থাকবে এবং আমরা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শ্রমের জয়গান গেয়ে যাব। এই হোক আমাদের ব্রত।

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : পরিবেশ এবং মানুষ পরিপূরক শব্দ-যুগল। পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির যোগানদাতা। মানুষ বা প্রাণিকূল পরিবেশের সুস্থতার মধ্যে নিজেদেরকে অভিযোজিত করেছে। কিন্তু সেই পরিবেশ যদি ক্রমাগত দূষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিকূলকতার মধ্যে চলে যায়, তবে প্রাণিকূলের অস্তিত্ব পড়বে হুমকির মুখে। এটিই স্বাভাবিক। মানব সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে সাথে পরিবেশের ওপর নানা রকম অত্যাচার আসে। আর তাতে বিপন্ন হয় এই মানব সভ্যতা। কিন্তু পরিবেশের এই দূষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবেশ দূষণের নানামুখী কারণ ও ফলাফল : পরিবেশ দূষণের নানামুখী কারণ রয়েছে। কোনো একটি বিশেষ কারণে পরিবেশ দূষিত হয় না। পরিবেশ দূষণের কিছু কারণ নির্দেশ করা যায় :

(১) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। আয়তনের তুলনায় এর জনসংখ্যা বেশি। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০৩৫ জন লোক বাস করে। আর এসব মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য খাদ্য থেকে শুরু করে বস্ত্র পর্যন্ত সব পরিবেশের নানা উপাদান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফলে পরিবেশের ওপর পড়ে ব্যাপক চাপ। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বন উজাড় হয়, আবাদী জমি কমে যায়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, শিল্পায়ন বেড়ে যায়, নগরায়ন বেড়ে যায়। ফলে নানামুখী কারণে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

(২) **রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার :** কৃষিকাজে এখন ব্যাপকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ ফলন হলেও পানি দূষণের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যা সত্যিই মানুষের জন্য ভয়াবহ বার্তা বহন করছে। এছাড়া এ-রাসায়নিক পদার্থ থেকে বায়ু দূষিত হচ্ছে।

(৩) **কলকারখানা বৃদ্ধি :** কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে কালো ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, যা এসিড বৃষ্টি ঘটিয়ে জীব জগতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। এছাড়া, কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে গিয়ে পড়ছে। ফলে নদীগুলো হারিয়ে ফেলছে তাদের জীবনী-শক্তি। এভাবে মৎস্য সম্পদের ঘাটতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশাপাশি নদীর জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে।

(৪) **অপরিকল্পিত ইটভাটা নির্মাণ :** অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র ইটভাটা নির্মাণ করে মাটি কেটে আবাদী জমি নষ্ট করা হচ্ছে এবং বন উজাড় করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে মানুষ নানামুখী রোগব্যাধির মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ ইটভাটার ধোঁয়া, বর্জ্য বা ছাই পার্শ্ববর্তী জমির ফসল নষ্ট করে উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

(৫) **যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল ব্যবহারের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ুকে আরো উষ্ণ করে দিচ্ছে। এছাড়া জলযান থেকে যে-ধরনের তেল বর্জ্য পানির সাথে মিশে যাচ্ছে, তা নদী দূষণের বড় রকমের কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এর ফলে নদীর যত প্রাণী আছে সব হুমকির মুখে পড়ছে। এছাড়া যানবাহনগুলো থেকে যে বিষাক্ত ধোঁয়া বের হচ্ছে, তা মানুষের নানা রকম রোগ ব্যাধির জন্য দায়ী।

(৬) **বন উজাড় :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন উজাড় হচ্ছে ব্যাপকভাবে। যেখানে বন থাকার কথা মোট আয়তনের ২৫% সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ১৩%। এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় যে, বনদস্যু থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিরা বন-উজারে নানামুখী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারচ্ছে।

(৭) **পানির নিচের স্তরের ব্যবহার :** পানির নিচের স্তরের ব্যবহারের ফলে পানির স্তর আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট বাড়ছে। এবং আর্সেনিকের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে চলছে। দেশের প্রায় ৬১টি জেলায় আর্সেনিক ধরা পড়েছে।

(৮) **বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব :** দেশের বড় বড় শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক করুণ দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। এই অব্যবস্থিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং বায়ু দূষণ করে।

(৯) **উচ্চ-শব্দ :** শহরে শব্দ দূষণ এক বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গেছে। যত্রতত্র হর্ন বাজানো, বাজি-পটকা ফুটানো, জনবসতির মধ্যে বিমানবন্দর ও কলকারখানা স্থাপনের ফলে শব্দ দূষণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে গেছে। যার কারণে পরিবেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া নষ্ট হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ।

প্রতিকার : পরিবেশ দূষণের প্রতিকার এখনই না করলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। কেননা পরিবেশ দূষণের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে। এ-থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া খুবই জরুরি:

(১) **বনায়ন সৃষ্টি :** বাংলাদেশে মোট বনভূমির শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ বন রয়েছে। তা আরো বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। ফলে সামাজিক বনায়নকে একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। বনায়নের জন্য পুরস্কার ঘোষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) **জ্বালানীর বিকল্প ব্যবহার :** আমরা যে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোলের মতো জৈব জ্বালানী প্রতিদিন ব্যবহার করি, তার পরিবর্তে বাতাস, সৌর ও পানি-মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমে আসবে। সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

(৩) **শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে ঐ বর্জ্য নদীতে গিয়ে নদীর কোন ক্ষতি না করতে পারে। এ-বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

(৪) **কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো :** কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের দিকে নজর দিতে হবে। যাতে ফসল থেকে শুরু করে মাটি, পানি দূষণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(৫) **ইট ভাটায় বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার :** ইট ভাটায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃক্ষ নিধন কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার আইনের মাধ্যমে তা করতে পারে।

(৬) **যত্রতত্র বর্জ্য না ফেলা :** শহরের নানা এলাকায় বর্জ্য থাকায় পরিবেশ নষ্ট হয়। এ-থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এই বর্জ্য আবার রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে নতুন কিছু তৈরি করা যায়।

(৭) **ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার না করা :** ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার করলে জ্বালানীর অর্ধ-দহনের ফলে কার্বন-মনো-অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস মানব শরীরে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং ওজোন স্তর ছিদ্র করে দেয়। ফলে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা উচিত।

(৮) **সরকারের করণীয় :** সরকারের উচিত আইনের মাধ্যমে পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং যারা পরিবেশের ক্ষতি করবে, আইনকে অমান্য করবে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করা।

(৯) **গণসচেতনতা বৃদ্ধি :** মানুষের মাঝে পরিবেশ সুস্থ রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে নানা প্রচার তুলে ধরা উচিত। তাতে করে পরিবেশ দূষণ রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা পাব সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ।

(১০) **গণমাধ্যমের ভূমিকা :** আধুনিক যুগে গণমাধ্যমের যে যুগান্তকারী বিপব সাধিত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রিন্ট-মিডিয়া থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষ সচেতন হবে এবং দূষণ অনেকাংশে কমে আসবে। তাই নিয়ম করে গণমাধ্যমকে একাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার : সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ পৃথিবী– এই শোগানে যখন বিশ্ব-মানব মুখর, ঠিক একই সময়ে চলছে নির্বিচারে পরিবেশ দূষণের মহাযজ্ঞ। ফলে সবশ্রেণির মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা। মনে রাখতে হবে আমাদের পরিবেশ আমাদের জীবন।

নারীশিক্ষা

ভূমিকা : বর্তমান সভ্যতা মানুষের ক্রমাগত শিক্ষার ফল। কেননা শিক্ষা হলো পরশ পাথরের মতো। শিক্ষার সংস্পর্শে আসলে মানুষের মন আলোকিত হয়ে যায়। তাই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিকে গঠনের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা। বিশ্বে মোট জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। অথচ এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ আজও কোন কোন সমাজে নিগৃহিত, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। একটি দক্ষ, মর্যাদাপূর্ণ, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের শিক্ষার সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে বলছেন– 'রাষ্ট্র যখন তার সকল নাগরিককে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তখন সে রাষ্ট্র আর কী করছে তাতে কিছু যায় আসে না। শিক্ষাহীন নাগরিক সর্বার্থে অদক্ষ।' এ-বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝাই যাচ্ছে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নারী তার বাইরে কিছু নয়।

নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি : কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে। পুরুষশাসিত সমাজই তাকে করে রেখেছে ঘরমুখো। কিন্তু এক সময় যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন নারীর স্বাধীনতা ও সার্বিক মুক্তি ছিল। কিন্তু পুরুষের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে নারী হয়ে যায় ঘরমুখো। এরপর নারীকে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য করতে হয়েছে এবং হচ্ছে দীর্ঘ সংগ্রাম। মুক্তির জন্য নারী প্রয়োজন অনুভব করেছে শিক্ষা গ্রহণের। নারীশিক্ষার ইতিহাস পাঠ করতে গেলে দেখা যায়, প্রথমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্যে। তাও বেশি দিনের কথা নয়। আধুনিককালে কিছু কিছু নারীর কথা জানা যায়। মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফট (১৭৫৯-১৭৯৭)-এর সময়েও নারীশিক্ষা অতটা সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর সময়ে নারীশিক্ষার সুযোগ ছিল সংকুচিত। কেননা বাসায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের চেষ্টা শিক্ষা চালিয়ে যান।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের এখানেও নারীদের শিক্ষার কিছুটা ঢেউ পরিলক্ষিত হয়। তাও সহজ ছিল না। নারীদের জন্য ছিল না কোন বিশেষ স্কুল। দু-একটি থাকলেও সবার সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা আমরা বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)-এর দিকে তাকালে বুঝতে পারি, তার জীবনে ব্যাপক সংগ্রাম করে শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। নানা রকম কুসংস্কারে আবদ্ধ থেকে নারীশিক্ষা যুগে যুগে হয়েছে দলিত। এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি নারীশিক্ষার অগ্রগতি খুব বেশি নয়; অন্তত পুরুষের তুলনায়। তারপরও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে দৃপ্ত পায়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'ইতিহাস সম্পর্কে যার কোন ধারণা আছে, তিনিই জানেন যে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কোন বড় সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।' অতএব, নারীকে সমাজ পরিবর্তনে সম্পৃক্ত করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তা বর্তমান বিশ্ব বুঝতে পেরেছে চমৎকারভাবে।

বর্তমানে নারী-শিক্ষার হালচাল : স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা বাস্তবায়নের জন্য নারীর অংশগ্রহণ এক অনিবার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য শিক্ষায় অনগ্রসরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তবে সরকার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বি.এ (পাস কোর্স) পর্যন্ত নারীশিক্ষা বিনাবেতনে করাসহ উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারী-শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত সমতার কথা উলেখ করা হয়েছে। এছাড়া নারীশিশু বিদ্যালয় থেকে যাতে ঝরে না পড়ে, সেজন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও নারীশিশু-শিক্ষার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা খুব বেশিদূর এগিয়ে আসতে পারছে না। এজন্য সরকার টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীশিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। ব্যাপক সংখ্যক নারী এখনও সেই প্রাচীন অন্ধ কুসংস্কারের প্রকোষ্ঠে বন্দী রয়েছে। নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে যে কারণগুলো বেশি চোখে পড়ে তা নিম্নরূপ–

১. কুসংস্কার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়গুলোর মধ্যে একটি। এখনও গ্রামে প্রায় অশিক্ষিত মানুষ মনে করে নারীদের বেশি পড়ালেখা করতে নাই। তারা শুধু স্বামীর ঘরে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকবে।
২. বাল্যবিবাহের কারণে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। কারণ বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে এখন একটি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে।
৩. চরম দারিদ্র্য নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়।
৪. নারীকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য যে সামগ্রিক পরিবেশ এবং অবকাঠামো প্রয়োজন, তা এখনো পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান নয়।
৫. পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো নারীশিক্ষার অন্তরায় বলে মনে করেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ। এ-অবস্থা থেকে অর্থাৎ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষদের সরে আসতে হবে।

নারীশিক্ষা প্রসারে করণীয় : নারী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ফলে, সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ, প্রগতি পুরুষের ক্রমবর্ধমান একক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কেননা, কার্ল মার্কস আরো বলেন– 'নারীর সামাজিক অবস্থান দ্বারাই সমাজ প্রগতির মাত্রা নির্ধারণ করা চলে।' আর সেই প্রগতির জন্য নারীশিক্ষা প্রসারের উপায় বের করতে হবে। নারীশিক্ষা প্রসারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. সরকার মাঝে মাঝে যে শিক্ষানীতি করে থাকে সেখানে নারীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
২. নারীরা যাতে নির্বিঘ্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে সেজন্য সরকারের উচিত বিশেষ নিরাপত্তা বিধান করা।
৩. ঘন ঘন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে নারীশিশুরা স্কুলে যেতে আগ্রহবোধ করবে। কোন প্রকার কষ্ট ছাড়া তারা স্কুলে গমন করতে পারবে।
৪. যদিও প্রাথমিক থেকে শুরু করে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তবু বেশি পরিমাণ উপবৃত্তির ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ-ব্যবস্থা করলে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি পাবে।
৫. নারীশিক্ষা অগ্রগতিকে সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংগঠন থেকে পরিবার পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সমাজ বা রাষ্ট্র যদি হয় একটি দুই চাকার গাড়ি, তবে নারী সেই গাড়ির এক চাকা আর পুরুষ তার অন্য চাকা। এই সমাজ-গাড়ির এক চাকা নারীকে ছোট রেখে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন বেশি দূর অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়। গাড়ি সচল রাখতে হলে দুই চাকা যেমন সমান রাখতে হয়, তেমনি সমাজের অগ্রগতির জন্যও নারীকে পুরুষের সমান তালে রাখতে হবে। আর এই সমতার জন্য, কাঙ্ক্ষিত সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষা। নারীশিক্ষার যথার্থ প্রসারই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : বাঙালি জাতির জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ইতিহাসের মধ্যে যে-ইতিহাস বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তির সনদ প্রদান করেছিল, তা মুক্তিযুদ্ধ। যে মহাকাব্যিক সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল, তা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বুকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ ত্যাগ, তিতিক্ষা, রক্ত, অশ্রুর বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন; আমাদের অহংকার।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। জন্ম নেয় দুটি রাষ্ট্র। একটি ভারত, অন্যটি পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুটি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। দুই অঞ্চলের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি এর পক্ষে ভোটও দিয়েছিল। কারণ, ইংরেজশাসিত ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানরা, বিশেষত পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানরা ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরি-বাকরি নানা দিক থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত। এই বঞ্চনা, অবহেলা আর দরিদ্রতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকেই দেখা গেল, পূর্ব বাংলার মানুষের ওই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যাচ্ছে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলে মনে করেছে। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মানুষকে তারা ভালো চোখে দেখত না। পদ, পদবি, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সবক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষকে তারা বঞ্চিত করত। ঠিক ইংরেজশাসিত ভারতের মতো। ফলে, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার, অবিচার, শোষণের শিকার হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু কিছুকাল পর থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ এই অত্যাচার, অবিচার আর শোষণ মেনে নিতে পারেনি। তারা বিভিন্ন সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে রুখে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী ষড়যন্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধ শুধু নয় মাসের ফল নয়, এর রয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বহু রক্তস্নাত রাজপথ পাড়ি দিয়ে স্বপ্নের স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রথমে যে আঘাতটি আসে তা হলো ভাষার ওপর। ভাষা হলো একটি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। তাকে ভেঙে দিলে ঐ জাতির মেরুদণ্ড অনেকাংশে ভেঙে পড়ে। শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় শতকরা ৪ ভাগ লোকের মুখের ভাষা উর্দুকে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। তাও তিনি ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায়। একইভাবে ২৪ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা করার কথা বলেন। কিন্তু আমাদের ছাত্ররা না না বলে প্রতিবাদ জানায়। এরপর চলতে থাকে ধারাবাহিক প্রতিবাদ-সংগ্রাম। আর পাকিস্তানি শাসকচক্র এসব আন্দোলন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে চালাতে থাকে নানামুখী নির্যাতন। এই নির্যাতনের সূত্রেই শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। দীর্ঘকাল কারাবরণও করেন। আবার ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন, জিন্নাহকে অনুকরণ করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ধর্মঘট, বিক্ষোভ চালাতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও এর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয়। অবশেষে ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং ঐদিন রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করায় পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এভাবে ভাষার মান রক্ষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। ভাষার মান রক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে। কবি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

হে ভাষা আন্দোলন,
তুমি স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু।

কেননা, ভাষা আন্দোলন হলো স্বাধীনতার প্রথম বপিত বীজ।

এরপর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র আর অবৈধ হস্তক্ষেপে মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত সরকার। এটি পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনের মধ্যে গভীর ক্ষত তৈরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা গোড়া থেকে শাসন-শোষণের দিকে বেশি নজর দিয়েছে, যা বাঙালিদের স্বাধীনচেতা করেছে। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করলে বাঙালি প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। শিক্ষাকে সংকুচিত করলে ১৯৬২ সালে দেখা দেয় তীব্র প্রতিবাদ। এভাবে দীর্ঘ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে তিনি প্রসারিত করেন। বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কেনো ছয় দফা ঘোষণা করলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন– 'স্বাধীনতার পথে যাওয়ার জন্য সাঁকো গড়ে দিলাম।' অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বিশেষ ট্রাইবুনালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিচারের পায়তারা করেন। ১৯৬৯ সালে রাজপথের গণঅভ্যুত্থান থেকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি, ৬-দফা দাবি এবং ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবির মুখে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান প্রবল হয়ে ওঠে আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এক পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসলে আইয়ুব খানের মসনদ নড়ে ওঠে। মূলত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান একটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন। এবং নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন এবং ঘোষণা করেন খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে। অবশেষে, ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। এছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩৮০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। এভাবে জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে তাদের মত প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করেন ইয়াহিয়া খান। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার ভান করে ৩ মার্চ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এমন পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যেখানে দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, শাসন, নিপীড়িনের ইতিহাস তুলে ধরেন। সেই ভাষণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের একটি নির্দেশনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন– 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি আরো বলেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।' এভাবে বাঙালি ভিতরে ভিতরে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকে।

অবশেষে ১৭ মার্চ টিক্কা খান, রাওফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীলনক্সা তৈরি করে। ২৫ মার্চ সেই বর্বরতম গণহত্যা শুরু হয়। যাকে ইতিহাসে 'কালরাত্রি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর পরপরই আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭ মার্চ সেনাকর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

যখন জনগণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানতে পারে তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্মরণ-কালের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ করে বাংলাদেশের মাটিতে। এ অবস্থায় বাঙালি সেনা, পুলিশ, বর্ডার গার্ড ইত্যাদি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অসংখ্য মানুষ ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদিকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। এ-সরকার শপথ বাক্য পাঠ করে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানী। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার বিদেশিদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের নানা উদ্যোগ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা, যুদ্ধ কৌশল ও নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করতে থাকে এই সরকার। কিন্তু এদেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পাকিস্তানিদের সমর্থনে গঠন করে রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনীর মতো আরো অনেক বাহিনী। তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে নানা অপকর্মের সাক্ষী হয়ে আছে। তাদের সহায়তায়, তত্ত্বাবধানে, মদদে আর অংশগ্রহণে বাংলার মাটিতে সংঘটিত হয় গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ। আর দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা করেছে বুদ্ধিজীবী নিধন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে এই জঘন্যতম ঘটনাটি ঘটায়। এইসব শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর পালিত হয় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

এদিকে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল বাঁধার মুখোমুখি হয়। চীন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অনেক বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এভাবে ভিতরে ও বাইরে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের কিছু অংশে আক্রমণ করলে ভারত বাংলাদেশের পক্ষে সৈন্য পাঠায় এবং যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানিদের পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। এভাবে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্যসহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করেন। এভাবেই ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয় আমাদের।

উপসংহার : স্বাধীনতা বাঙালির জীবনে খুব সরলভাবে আসেনি। ৩০ লক্ষ প্রাণ, অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এবং দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি আমাদের সার্বভৌমত্বের বড় উদাহরণ হিসাবে ধরা দিয়েছে। এ-স্বপ্নের দেশটিকে স্বাধীন করেছিল বাংলার প্রতিটি মানুষ। তাদের স্বপ্ন ছিল এই রাষ্ট্রে শোষণমুক্ত সমাজ, আইনের শাসন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। এই স্বপ্ন এই চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণই মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মারক। এখানে 'মুক্তি' বলতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিকে বোঝানো হয়েছে আর 'স্বাধীনতা' মানে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি জাতির সবার মূল চেতনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা : কিছু কিছু সময় মানুষ ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে, আবার কিছু কিছু সময় মানুষের কাছেই ইতিহাস ঋণী হয়ে যায়। মানুষ যখন ইতিহাসের নির্মাতা নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে, তখন তাঁদের অমর কীর্তি বর্ণনা ছাড়া কোনো ইতিহাসের পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি একজন মানুষ। তিনি বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের নির্মাতা। বাংলাদেশের ইতিহাস আর তাঁর ইতিহাস অভিন্ন। মূলত তাঁর জীবনের ইতিহাসই বাংলাদেশের ইতিহাস। অন্যকথায় বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসই তাঁর ইতিহাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি আজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন। ক্রমে তিনি হয়ে উঠেছেন 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা'। শেখ মুজিব থেকে 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে 'জাতির পিতা' হয়ে ওঠার দীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে তাঁর ত্যাগ স্বীকারের বিশাল পাহাড়।

জীবন-কথা : বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়রা খাতুন। তাঁর বাবা ছিলেন গোপালগঞ্জ আদালতের নাজির। তিনি চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন তৃতীয়। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন জ্ঞাতি ভগ্নি ফজিলাতুন্নেসার (রেনু) সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে বি.এ পাস করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন।

স্কুল জীবনে গোপালগঞ্জ সফরে এলে বাংলার তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়েন শেখ মুজিবুর রহমান। ইসলামিয়া কলেজে আই.এ ক্লাসে পড়াকালীন এই সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়। এ-সময় তিনি আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী বলে কথিত গ্রুপের ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন সময়ে 'নিখিল

ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন', 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের' কাউন্সিলার এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার মুসলিম লীগ এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন।

বাংলার দরিদ্র মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপরে ঢাকায় এসে নতুন রাজনীতির ধারায় নিজেকে মেলে ধরেন নতুন রূপে। কিন্তু মুসলিম লীগ সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। মুসলিম লীগ সরকার জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন।

মুসলিম লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী স্বৈরাচারী নীতির বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। একই বছর ২ মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে তিনি এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। একই বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালন কালে তিনি ঢাকায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচরীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার হন। ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি এর যুগ্ম-সম্পাদক হন। তিনি খাদ্য সংকটে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে আর একবার কারারুদ্ধ হন ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। এ-অবস্থায় ১৯৫২ সালে ফরিদপুরে জেলখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের মার্চে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী নির্বাচিত হন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর কাউন্সিল সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের 'শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন' দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হলে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ডজন খানেক মামলা হয়। ১৯৫৯ সালে মুক্তি লাভ করলেও বছর দুয়েক তাঁকে গৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। আবার ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে কারারুদ্ধ করলে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ-পরিপ্রেক্ষিতে আবার শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দীর এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে 'তাসখন্দ চুক্তি'-র পটভূমিকায় ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করেন এবং ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত খুবই জনপ্রিয় একটি কর্মসূচী। কিন্তু এই জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে। এ-দিকে জনসাধারণ এ-মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং ৬ দফা কার্যকরের দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। শুরু হয় গণ অভ্যুত্থান। ফলে জনদাবির তোপের মুখে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক চক্র ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এ-মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এক গণসংবর্ধনায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর আইয়ুব খানের পতন হয় এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। বাঙালি জাতিসত্তাকে শাণিত করার লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' শ্লোগান উদ্ভাবন করেন। ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখেন 'বাংলাদেশ'। এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপুল ভোটে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু অধিবেশন বসাতে গড়িমসি করায় আওয়ামী লীগ এবং বাংলার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত করাতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই মধ্যে ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণটি ছিল খুবই গুরুত্ববহ ও দিক নির্দেশনাধর্মী ভাষণ। ঐ উত্তাল সময়ে এই ভাষণ ছিল যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম উচ্চারণ। ভাষণে তিনি বলেন 'এবারের সংগ্রাম

আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতার জন্য একটি নির্দেশনা দিয়ে দেন। যার প্রেক্ষিতে বাঙালি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক জান্তারা মিলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ 'অপারেশন সার্চলাইট' অর্থাৎ জঘন্য গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। ঐ রাতেই আনুমানিক ১.৩০ মিনিটে তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত স্বাধীনতার ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঐ নির্দেশিত পথেই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ছিলেন ঐ সরকারের রাষ্ট্রপতি। তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণ এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাঁর শাসনামলে ১০৪টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া জাতিসংঘ, কমওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সংস্থার সদস্যপদ আদায়ে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে একটি সংবিধান প্রণীত হয়, যা সত্যিই একটি গুরুত্ববহ কাজ ছিল। সংবিধানে বাংলাদেশের চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর তিনি একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি, ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তি, একই বছর ফারাক্কা চুক্তি সম্পন্ন করেন। তিনি 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' প্রদত্ত 'জুলিও কুরী পদক'-এ ভূষিত হন। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম 'বাংলায় ভাষণ' প্রদান করেন। এরপর, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সংবিধান সংশোধনের কাজে হাত দেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সংবিধান সংশোধন করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তা দ্বারা সপরিবারে নিহত হন।

মূল্যায়ন : বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক জীবনের মূল্যায়ন করা একটি ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর বিষয়। ১৯৪৭-এর পরে যে শোষণ, শাসন ও ত্রাসন তা থেকে মুক্ত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে নিয়ে তিনি অবিভক্ত ভারতের রাজনীতি থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, তিনি জানতেন রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়া এসব অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি প্রথম ছাত্র সংগঠনের অন্যতম সদস্য হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। কেননা তিনি জানতেন ছাত্রদের মধ্যে যে চেতনা তা-ই পারে একটি জাতিকে তার ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে। ১৯৪৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি জেলে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তৎপরতা আর কর্মনিষ্ঠার কারণে তাঁকে 'যুগ্ম সম্পাদক' করা হয়। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এরপর তিনি দুইবার মন্ত্রিত্ব পেয়েও নিজের ক্ষমতার দিকে না তাকিয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবেছেন। জীবনের একটা বড় সময় পার করেছেন জেলখানায়। তার বর্ণনা আমরা পাই ২০১২ সালে প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটিতে। তিনি ৬-দফা দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাণের একেবারে অন্দরমহলের নেতা হয়ে ওঠেন। কেননা ছয় দফার মধ্যেই তিনি সাধারণ মানুষের চোখে ধরিয়ে দেন যে, আমরা কিভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছি এবং অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি। এই ছয় দফার মধ্যেই তিনি স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ এবং প্যারা-মিলিটারির প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। বিষয়গুলো পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেউ বুঝতে পারলেও উত্থাপন করেনি। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে। ছয়-দফাকে তিনি এবং বাংলার আপামর জনগণ মনে করতেন বাঙালির মুক্তির সনদ।

এছাড়া ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয়ের পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। এভাবে জনগণ তাঁর দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করিয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রাম বলতে– অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আর স্বাধীনতার সংগ্রাম বলতে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। এটি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফল। এছাড়া ৭ মার্চের ভাষণ যেন প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণের প্রতিধ্বনি। ফলে এ-ভাষণ আর শুধু বাঙালির ভাষণ হয়ে রইল না, এটি মহাকালের ভাষণ হিসাবে পরিগণিত হল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে আত্মপরিচয়হীন যুদ্ধ-শিশুদের সম্পর্কে বলেন– যারা যুদ্ধ-শিশু আছে তারা যেন তাদের পিতার নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দেয় এবং ঠিকানা ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়ির কথা লিখে দেয়। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি বাংলার মানুষকে কতটা ভালবেসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন– 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখে আমার হিমালয় দেখা হয়ে গেছে।' পাহাড়ের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু সত্যিই অতুলনীয়।

উপসংহার : কেউ কেউ পৃথিবীতে তাঁদের কৃতকর্ম দিয়ে ইতিহাসের বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি আর নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হন না। তিনি হয়ে ওঠেন মহাকালের; সারা পৃথিবীর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি ব্যক্তিত্ব। তাঁর মহান আত্মত্যাগে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ড পৃথিবীতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এই রাষ্ট্রের স্থপতি, জন্মদাতা, প্রাণদানকারী। তাই ইতিহাস তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

আমার প্রিয় কবি

সব বন্ধুই যেমন প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে না, তেমনি সব কবিই প্রিয় কবি হয় না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সংগ্রাম আছে। আছে তার না পাওয়ার, বঞ্চিত হওয়ার শোষিত হওয়ার ইতিহাস। তেমনি আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনে যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শোষণ-শাসন ও ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তা একজন কবির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। তিনি হলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। যখন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমি পাঠ করি তখন যেন আমার চেতনারই প্রতিচ্ছবিই তাঁর কবিতার মধ্যে ভেসে ওঠে। তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন প্রেম আছে, তেমনি আছে দ্রোহ। যেমন আছে রুদ্র রূপ তেমনি আছে সরল স্নিগ্ধতা। এ-যেন একটি সম্পূর্ণ জীবনের রূপকল্প। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম আমাকে মুগ্ধ করে।

নজরুলের জীবন : কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ আর মা জাহেদা খাতুন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। পর পর চার ছেলের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম। ফলে নজরুল ছিলেন বাবা-মায়ের খুবই কাঙ্ক্ষিত সন্তান। এ-কারণে, শৈশব তাঁর মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। শুরু হয় তাঁর দুঃখের জীবন, সংগ্রামী জীবন। দারুণ অর্থ কষ্টে পড়ে যান নজরুল ও তাঁর পরিবার। দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে তিনি চুরুলিয়া গ্রামের মক্তব, মসজিদ দেখাশুনার কাজ করে অর্থ উপার্জন শুরু করেন। এগার বছর বয়সে তিনি যোগ দেন লেটো গান ও যাত্রার দলে। নজরুলের এক আত্মীয়ের লেখা থেকে জেনেছি, 'বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না, তাই নজরুল এইসব লেটোর দলে যান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন।' শুনে বিস্মিত হতে হয় যে, নজরুলের বয়স যখন বার কি তের, তখন তাঁর নাটক রচনা এত ভালো হতে লাগল যে, তিনি এক সাথে তিনটি লেটো গানের দলে নাটক রচনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এমন কি তিনি তাদের জন্য তাৎক্ষণিক গানও লিখে দিতেন। আরো বিস্ময়, তিনি বড় বড় কবিয়ালদের সাথে কবির লড়াইও করতেন মাঝে মধ্যে। এত ছোট মানুষের এত পারদর্শিতা দেখে বড়রা তাঁকে সমীহ করে 'খুদে ওস্তাদ' এবং ইয়ার্কি করে 'ব্যাঙ্গাচি' বলত। তাঁকে 'তারা খ্যাপা', 'নজর আলী', 'দুখু মিয়া' নামে ডাকা হতো। বড় বড় কবিয়ালদের সাথে কবির লড়াইয়ে গেলে খুদে নজরুল তাদের ছেড়ে কথা বলতেন না। কিশোর নজরুলের তেজ আর রসিকতা একটি উদাহরণ–

ওরে ছড়াদার that পালাদার
মস্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী cad
monkey লড়বে বাবর-কা সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত
জানে না ও, ছোট্ট হলেও
হামভি Lion cad.

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও নজরুলের মুখ এবং মন থেকে হাসিটা কিন্তু মুছে যায়নি। লেখাপড়াও ছেড়ে দেননি। ১৯১১ সালে ঠিকই তিনি ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণিতে। কিন্তু টাকার অভাবে সেখানে বেশিদিন পড়তে পারেননি। বর্ধমান রেল স্টেশনের এক গার্ড সাহেবকে দেড় মাইল হেঁটে খাবার পৌঁছে দেয়ার কাজ নেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যে এই চাকরিটাও খোয়াতে হয় নজরুলকে। এরপর কাজ নেন রুটির দোকানে, এক টাকা বেতনে। পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর রফিজউলাহ নজরুলকে রুটির দোকান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে। এটাই কিন্তু বাংলাদেশে নজরুলের প্রথম আসা। সেখানে দরিরামপুর হাইস্কুলে দরদি রফিজউলাহ তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন সপ্তম শ্রেণিতে। এখানে তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আর না পড়ে, নজরুল আবার পাড়ি জমান তাঁর নিজ দেশে। সেখানে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। শৈশব থেকে যৌবনের শুরু পর্যন্ত নজরুলের জীবন কেবল সংকট আর সংগ্রামে ভরা। এসময় নজরুল মচকেছেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি। ঠিকই তিনি একদিন হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের জীবনের এই সংগ্রাম আর প্রত্যয় আমাকে নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

নজরুলের সাহিত্য : কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা কবিতা ছিল মূলত একান্ত ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেগ-অনুভূতি নির্ভর। নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, আধিপত্যবাদের বিরোধিতা নজরুলের আগে ছিল না বললেই চলে। কবিতাও যে আণবিক, দাহ্য, সশস্ত্র হতে পারে বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম দৃষ্টান্ত কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাও যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এটি নজরুলই প্রথম প্রমাণ করলেন। নজরুলের কবিতা শাসক, শোষক, অত্যাচারীর গায়ে যেন তীব্র কশাঘাতের কাজ করেছে। একারণে একর পর এক নজরুলের কাব্যগ্রন্থ হয়েছে নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত। নজরুলের কবিতায় শোষক, আধিপত্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ দেখে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'বিদ্রোহী কবি'। নজরুল নিজেও ঘোষণা করেছেন–

মহা–বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

শুধু বিদ্রোহে নয়, নজরুল সাম্যবাদী চেতনাতেও সমান সোচ্চার। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার দৌড় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বনি-নির্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নজরুলের সমাম্যবাদ আরো বিস্তৃত। তিনি ধর্মীয় অসাম্য, নারী-পুরুষের অসাম্য, জাতিগত অসাম্য, পাপী-নিষ্পাপ অসাম্য, রাজা-প্রজার অসাম্য, চোর-সাধুর অসাম্য ইত্যাদি সর্ব প্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন। নজরুলের ভাষায়–

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

শুধু সাম্য নয়, অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশেও বাংলা কবিতায় নজরুলের জুড়ি মেলা ভার। এক্ষেত্রে নজরুলের সঙ্গে তুলনা চলে বোধ করি কেবল লালন শাহ্-এর।

নজরলের প্রেমিক সত্তা বাংলা কবিতার অন্য কবিদেও থেকে আলাদা করে সহজেই চেনা যায়। অভিমান আর তীব্র মানবিক বিরহ বোধ নজরুলের রোমান্টিক কবি-সত্তাকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে–

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন–
স্মরণ বেলায় নিদ্রাহীন

হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার !

নজরুল বড়দের জন্য যেমন সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি ছোটদের জন্যও রচনা করেছেন অসংখ্য ছড়া, কবিতা ও গান। আমার শৈশব-কৈশোরের বই পড়ার আনন্দকে তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। নজরুলের শৈশব-কৈশোর এক নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট আর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাটলেও তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন এক অসামান্য জগৎ। তাঁর অসংখ্য ছড়া, কবিতা ও গানের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নকে।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলাম আমার কৈশোর থেকে ভালো লাগা কবি। তাঁর কিশোর কবিতার মধ্যে আমি পেয়েছি আমার দুরন্ত কৈশোর। দারিদ্যের সঙ্গে অবিশ্বাস্য সংগ্রাম করে তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠা শুধু আমাকে নয় অসংখ্য কিশোর-যুবকের বেড়ে ওঠার প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আর নজরুলের প্রতিবাদ-বিদ্রোহ আমার অধিকতর মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যবরণ করলেও প্রিয়তার গভীরতায় আর প্রতিয়িত পাঠের ব্যাপকতায় নজরুলকে আমার কাছে অমর-অম্লান বলেই মনে হয়।

প্রবন্ধের নমুনা

সততা

সংকেত : ভূমিকা, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, সততার শক্তি, সততার বিরুদ্ধ শক্তি, সততার সামাজিক মূল্যায়ন, মহৎ মানুষদের জীবনে সততা, উপসংহার।

যানজট

সংকেত : ভূমিকা, যানজট কী, যানজটের কারণ ও ফলাফল, যানজট সমস্যা নিরসনের উপায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, উপসংহার।

বাংলাদেশের উৎসব

সংকেত : ভূমিকা, উৎসব কী, উৎসবের গুরুত্ব, বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম উৎসব ও এর বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের উৎসব ও এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব, বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসব, বাংলাদেশের সার্বজনীন উৎসব, বাংলাদেশের উৎসবের বর্তমান সংকট, বাংলাদেশের উৎসবের সংকট নিরসনের উপায়, উপসংহার।

আমার প্রিয় শিক্ষক

সংকেত : সূচনা, শিক্ষক বলতে আমি কী বুঝি, আমার প্রিয় শিক্ষকের পরিচিতি, প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরন, কেন প্রিয় শিক্ষক, আমার প্রিয় শিক্ষকের গুণাবলি, উপসংহার।

শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা

সংকেত : অবতরণিকা, গণমাধ্যম কী, গণমাধ্যমের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের গভীরতা, শিক্ষা বিস্তার ও টেলিভিশন, শিক্ষা বিস্তার ও সংবাদপত্র, শিক্ষা বিস্তার ও চলচ্চিত্র, শিক্ষা বিস্তার ও দূরদর্শন, শিক্ষা বিস্তার ও বেতার, উপসংহার।

বনায়ন

সংকেত : সূচনা, বনায়ন কী, বনায়নের গুরুত্ব, বনায়ন ও পরিবেশ, বাংলাদেশের বনায়নের একাল-সেকাল, বনায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য, উপসংহার।

যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব

সংকেত : ভূমিকা, বিশ্বে যুদ্ধের ইতিহাস, বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ দেশে-দেশে, যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধের ফলাফল, বিশ্বব্যাপী মানুষ যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব চায়, যুদ্ধমুক্ত বিশ্বের জন্য করণীয়, উপসংহার।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

সংকেত : সূচনা, জাতীয় পতাকার গুরুত্ব, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্ণনা, জাতীয় পতাকার আকৃতি, জাতীয় পতাকার রঙের প্রতীকী গুরুত্ব, জাতীয় পতাকার ব্যবহার, উপসংহার।

জনসেবা

সংকেত : ভূমিকা, জনসেবা কী, কৈশোর ও জনসেবার মনোভাব, জনসেবার সামাজিক গুরুত্ব, বিশ্বের বিভিন্ন জনসেবামূলক সংগঠন, পৃথিবীর মহৎ মানুষেরা ও জনসেবা, জনসেবা ও মূল্যবোধ, উপসংহার।

ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের সাহিত্য

সংকেত : সূচনা, ভাষা আন্দোলনের পরিপেক্ষিত, ভাষা আন্দোলনের চেতনা, বাঙালির জাতীয় জীবনের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সম্পর্ক, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের কবিতা, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের উপন্যাস, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটক, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের প্রবন্ধ, উপসংহার।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

সংকেত : ভূমিকা, পর্যটন শিল্প কী, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অতীত ও বর্তমান, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা নিরসনে করণীয়, উপসংহার।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সংকেত : ভূমিকা, মানব সম্পদ উন্নয়ন কী, বাংলাদেশের মানব সম্পদের বর্তমান চিত্র, মানব সম্পদ উন্নয়নের সুবিধা, মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দেশের উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ, উপসংহার।

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা :

সংকেত : ভূমিকা, খেলার বিশেষত্ব, আন্তর্জাতিক অর্জন, খেলার বর্ণনা, উপসংহার।

ক্রিকেট ও বাংলাদেশ

সংকেত : সূচনা, ক্রিকেটের ইতিহাস, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাস, বাংলাদেশের ক্রিকেটের বিশ্বজয়, বাংলাদেশে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার উন্নতির অন্তরায়, বাংলাদেশে ক্রিকেটের সমস্যা সমাধানের উপায়, উপসংহার।

নিবিড় অরণ্যে একাকী

সংকেত : ভূমিকা, অরণ্যে একাকী, অরণ্যের সৌন্দর্য, অরণ্যে মনের অবস্থা, অরণ্যের সংকট, উপসংহার।